ক্ষমা নেই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশ
৫৯, পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৭

প্রকাশক : প্রসূন বসু

১৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স

১৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুজিত দস্তিদার

সবিনয় নিবেদন এই

দুটি বাদে এ বইয়ের আর সব লেখাই বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। বন্ধু কথাশিল্পী সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ জোর না করলে এবং আগ্রহ না দেখালে হয়ত লেখাই হত না। লেখানোর কৃতিত্বটা তাঁর ; লেখার দোষত্রুটিগুলো সম্পূর্ণভাবে আমার।

অনেকদিনের একটানা গুমোটের পর এ রাজ্যে আবার একটু খোলা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, মনের কথা খুলে বললে এখন আর মাথা কাটা যাওয়ার তেমন ভয় থাকবে না।

সব কিছু ছকে ফেলে ভাবা একরকমের যান্ত্রিকতা। আসলে বাঁধাধরাকে নড়িয়ে চড়িয়ে দেয় মানুষের মন। মন বেঁকে বসলে অনেক বজ্র আঁটনিই হয়ে পড়ে ফস্‌কা গেরো।

যান্ত্রিকতার একটা বড় দোষ, মানুষকে নিতান্তই অবস্থার দাস ব'লে মনে করে। কিন্তু কলের এই হিসেবটাকে বদ্‌লে দেয় কল্‌জে। যারা তা না মানে, তারা হাত পা ছুঁড়ে যতই প্রগতির কথা বলুক—আদতে তাল ঠুকে যেখানকার সেখানে থাকাতেই তারা বিশ্বাসী।

এরই মধ্যে থাকে অনেক ভয়, অনেক সন্দেহের বীজ। কাউকে বিশ্বাস নেই। চারদিকে গণ্ডী দাও। আত্মরক্ষা করো। আগেভাগে আক্রমণ ক'রে আক্রমণ ঠেকাও। দখল বাড়াও।

এ এক রকমের মানসিক রোগ। যা নয় তাই ভাবা। বাস্তব সম্পর্কে মনগড়া ধারণা করা। গোড়ায় মনকে একেবারে না মেনে এর শুরু; পরে সেই মনের কাছেই চোখ বুঁজে হাতজোড় ক'রে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

যান্ত্রিকতার সঙ্গে তাই দৈবে বিশ্বাসের একটা মিল আছে। দুটিই অকাট্য। শুধু তফাৎ এই—একটি পথ ডাইনে, একটি বাঁয়। কিন্তু নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যায় একই জায়গায়।

অনেকের অনেক সাধের তত্ত্ব নস্যাৎ ক'রে, অনেক থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দিয়ে বাংলাদেশ মুঠোয় এনেছে তার স্বাধীনতা।

নাটকের আরম্ভেই নায়ক শত্রুর হাতে বন্দী। তাতে অন্য কুশীলবেরা হাল ছাড়ে নি। তারা জারী করে দিয়েছে লড়াই।

ব্যস, অমনি শুরু হয়ে গেল তত্ত্বের জাল বোনা। এটা ভুল, ওটা হতেই পারে না। দরে বনলেই আপোষ করবে। সবুর করো, দেশের লোককে ল্যাং মারল ব'লে। কেননা ও তো অমুকের দালাল। এর সঙ্গে ওর ফারাক নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি। আন্দাজের ঢিল একটাও লাগল না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। ভুয়ো তত্ত্বের কবরের ওপর খোলা আকাশের নিচে পত পত ক'রে উড়ছে তার জয়পতাকা।

পণ্ডিতেরা ভুল করলেও সাধারণ মানুষ ঠিকেয় ভুল ক'রে নি। তার কারণ, তাদের হিসেবটা দেখে এবং ঠেকে। যে তত্ত্ব চোখে দেখে না, কানে শোনে না—আসলে সেটা তত্ত্ব নয়, আকাশকুসুম কল্পনা।

লেখা মানেই দেখানো এবং শোনানো। লেখকের দেখায় এবং শোনায় কোনো ভুল হলে পাঠক তা ধরিয়ে দেবেন—লেখকে-পাঠকে সন্তানে সম্পর্ক নয়, সম্পর্কটা সহযোগের।

প্রকাশককে ধন্যবাদ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি এ বইয়ের ঝুঁকি নিয়েছেন। তাঁর লোকসান হলেও তাতে লেখকেরই লাভ।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একই হাতে যাঁর অসি আর মসী, সেই

হিমাচলবাসী বাংলার বন্ধু

শের জঙ্গ-কে

সকালের অপেক্ষায়

একই দিনে সকালের কাগজে আগরতলায় বোমা পড়ার খবর আর রাত্রে বেতারে যুদ্ধাবস্থার ঘোষণা। মাঝে শুধু ষোল ঘণ্টা সময় আমি কলকাতার বাইরে—তার মধ্যে পাঁচ থেকে ছ ঘণ্টা কাটিয়েছি মাইল তিনেক ভেতর অবধি বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজের শিবিরে, বাঙ্কারে আর শত্রুমুক্ত গ্রামে।

তবু অন্তত বর্ডার অবধি ঘুরে আসা যাবে এই রকমের একটা ভরসা পেয়ে মুক্তিফৌজের সাহায্যকারী তিন বন্ধুর একটি দলের সঙ্গে আমি জুটে গিয়েছিলাম।

কারো থাকে মাথায় পোকা। কারো পায়ে থাকে ঘুরঘুরে পোকা। সেই পায়ের পোকা আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে হরদম ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মাসকয়েক আগে মঈদুর যখন আমাকে মুক্তাঞ্চল ঘুরে দেখে আসতে বলেছিল, তখন আমার হাত জোড়া—শরীরটাও যুতসই ছিল না। পরে আমি যখন তৈরি হলাম, তখন লড়াইয়ের ঘোরালো অবস্থা। আমাকে আর অমৃত রায়কে মঈদুর সাফ জানিয়ে দিল, ভেতরে যাওয়া

এখন আর সম্ভব নয়। এরপর চেষ্টা করলাম অন্য মহলে। সেখানেও সেই এক কথা। ভেতরে যাওয়া এখন নিরাপদ নয়।

কোনো কাগজের লোক হলে একটা হিল্লে হয়ত হয়ে যেত। কিন্তু কাগজের রাজ্যে আমি নাম-কাটা সেপাই। কাজেই আমার সামনে কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না।

সত্যি বলতে কি, হাল ছেড়ে দিয়েই বসেছিলাম। হঠাৎ টেলিফোনে পাকড়াও করে আমাকে হালে পানি পাইয়ে দিল সমীর মোদক। সীমান্ত পার করবার কথা দেয় নি। বলেছিল মুক্তিবাহিনীর ডেরা অবধি পৌঁছে দেবে। পাথরচাপা কপাল না হলে ভেতরে যাওয়ারও একটা সুযোগ জুটে যেতে পারে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী। দিনও তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম। ৩রা ডিসেম্বর।

সকালের বাসে গিয়ে সীমান্ত দেখে সন্ধ্যের শেষ বাস ধরে রাত্তিরে কলকাতায় ফেরা। সফরের এই ছিল ছক। আগে কি আর জানতাম, এই ছকের জন্যে পরে আপসোস করতে হবে? যখন জানলাম তখন আর তা থেকে ফেরবার কোনো উপায় নেই।

আমরা যারা নিরাপদ দূরত্বে থাকি, উপদ্রুত বর্ডারের কাছাকাছি এলাকা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো অনেক সময়ই হয় মনগড়া। বাসে আসতে আসতে সেটা টের পাচ্ছিলাম।

সকালের বাসে তো বটেই, এমন কি শেষ বাসেও, সারা রাস্তা যাত্রীদের যাতায়াতের বিরাম নেই। লোকজনের কথাবার্তায় চাল-চলনে জীবনযাত্রায় কোথাও এতটুকু আতঙ্কের ভাব দেখলাম না। ইস্কুল কলেজ দোকানপাট সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে।

নৌকোয় ইছামতী পার হয়ে আমরা প্রথমেই গেলাম মুক্তিফৌজের হাউনিতে। গেটে দুজন কমবয়সী বন্দুকধারী পাহারা।

হক সাহেব অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন।
একপাশে পূর্ব বাংলার একটা পুরনো বাস। এক জায়গায় ট্রাক থেকে খালাস করা হচ্ছে মর্টারের গোলা।
গাছের নিচে টেবিল পাতা। চারপাশে চেয়ার। খানিক পরেই চা এসে গেল।
একটু ইতস্তত করে তারপর সীমান্তের ওপারে যাওয়ার কথাটা পাড়া হল। সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলে দিলেও আমরা কিছু মনে করতাম না। হক সাহেব একটু ভাবলেন। তারপরই রাজী হয়ে গেলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে লোক যাবে। তা ছাড়া মুক্তিফৌজকে ডিফেনসের জায়গায় খাবার পৌঁছে দেবার জন্যে বাহক-দের নিয়ে খানিকটা রাস্তা যাবে জীপ। কাজেই এপারে কিছুটা রাস্তা আমরা হাঁটার হাত থেকে বাঁচব।
দেয়ালে টাঙানো সেক্টরের বড় ম্যাপে অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে দিলেন হক সাহেব। এই হল ভোমরা-সাতক্ষীরা রাস্তা। দুপাশ থেকে সরে এসে রাস্তা জুড়ে মাঝখানের এই দুটো জায়গায় পাক ফৌজ ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় জায়গায় মুখোমুখি হয়ে জমির ওপর বাঙ্কার খুঁড়ে আক্রমণের অপেক্ষায় আছে একদল মুক্তিফৌজ। এই পর্যন্ত যেতে পারবেন আপনারা। দক্ষিণে এই বিরাট জায়গা জুড়ে একটানা মুক্তাঞ্চল। তাছাড়া সাতক্ষীরার রাস্তাটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে পুরোটাই আমাদের দখলে।
হতাহতের অনুপাত কি রকম?
ওদের প্রতি এক শো'তে আমাদের এক কিংবা দুই।
শিবিরে আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা বললেন, আগে এলে দেখতেন এখানে গিজ গিজ করছে লোক। এখন সবাই বর্ডার পেরিয়ে ভেতরে অনেক দূর এগিয়ে এগিয়ে চলে গেছে।

পাক সৈন্যদের মনোবল কি রকম ?

মারতে তো কসুর করছে না ওরা। তবে ধরা পড়লে ওদের দেখতে হয়। ভয়ে থর থর করে কাঁপে। মনের জোর ব'লে কিছু নেই, অস্ত্রের জোরই ওদের জোর।

কথা শেষ ক'রে জীপে উঠলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে দিয়ে গরুর গাড়ির রাস্তা যতদূর, সেই অবধি গিয়ে থামল। খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘরে ইস্কুল হচ্ছে। আশপাশের বাড়িগুলোতে চরকা আর তাঁত চলার শব্দ। ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে ব্যাণ্ডেজের কাপড়।

গ্রামের নাম পানিতর। দেখলেই বোঝা যায় বর্ষার সময় পাশের ঢালু জায়গাটা জলে জলাকার হয়।

কিছু কিছু জায়গায় নদীর জোয়ারের জল আটকা পড়ে থাকে। তার ওপর বাঁশের সাঁকো।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে কাটা খাল। এই খালের ওপারে আগেকার পাকিস্তান আর এখনকার বাংলাদেশ।

এই খালের এপার-ওপার জুড়ে বিরাজ করছে সীমান্তের আইনভাঙা বাঁশের এক সাঁকো। পাক বর্গীর হাঙ্গামায় হাজার হাজার ওপারের লোক শরণার্থী হয়ে এসেছে এপারে। এই সাঁকো দিয়েই আবার শরণার্থীরা ওপারে ফিরবে।

সাঁকোটা পেরিয়ে যখন বাংলাদেশের মাটিতে পা দিলাম তখন খুব অবাক লাগল। মাটিতে গাছপালায় মানুষের হাবভাবে আর ভাষায় কোথাও কোনো তফাত নেই।

দুজন বয়স্ক লোক বাঁধ-রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। একজনের বাড়ি সাকরায়, আরেকজনের গয়েসপুরে।

বার বার করে তারা জানতে চাইল রাস্তা চেনাবার জন্যে আমাদের

সঙ্গে তাদের যাওয়ার দরকার আছে কিনা।

আমাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের যে লোকটি পথপ্রদর্শক হয়ে হাঁটছিলেন, তিনি যেতে যেতে বললেন—এখানকার সমস্ত গ্রামের লোকই এতদিন গোপনে গোপনে আমাদের সাহায্য করে এসেছে। গ্রামে লোকজন থাকলে মুক্তিফৌজের খুব সুবিধে হয়। তাদের কাছ থেকে খাবার আর খবর একসঙ্গে দুটোই পাওয়া যায়।

বাঁধের ডানদিকে একটু এগিয়ে একটা স্লুইস গেট। মুক্তিবাহিনী গোড়ার দিকেই ডিনামাইট দিয়ে সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল; তার ফলে, বড় একটা এলাকা জলে ডুবে যাওয়ায় পাক ফৌজ বেশি দূর এগোতে পারে নি।

বাঁ দিকে বাঁধের রাস্তা বরাবর সাতক্ষীরার রাস্তার দিকে আমরা উত্তরে এগোতে থাকলাম। কিছুদূর অন্তর অন্তর পাশে পরিত্যক্ত বাঙ্কার আর গড়খাই। মুক্তিফৌজ যেমন যেমন এগিয়েছে, সেই মত পুরনো বাঙ্কার ছেড়ে নতুন বাঙ্কারে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সবচেয়ে আগুয়ান বাঙ্কার এখন পাঁচ মাইল ভেতরে। পাক ঘাঁটির প্রায় নাকের গোড়ায়।

বাঁধের রাস্তা থেকে পুবের দিকে গাঁয়ের পায়ে-চলা রাস্তায় নামতে নামতে আমাদের পথপ্রদর্শক বন্ধুটি বললেন, ঐ যে দেখুন রিফিউজি লতা—এ অঞ্চলে বন্যার পর হয়েছে।

বাঁধ থেকে গাঁয়ের রাস্তায় নেমে গেছে খুঁটির গায়ে জড়ানো তার। এই তার দিয়ে মূল শিবির আর অগ্রবর্তী প্রত্যেকটি ঘাঁটির মধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

বুনো ঝোপঝাড়ে চারদিক ছেয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যায় এ রাস্তায় অনেকদিন মানুষ পদার্পণ করে নি। বেশ খানিকটা এগোবার

পর মধ্যবিত্ত ঘরের দুটি ছেলেমেয়েকে আসতে দেখা গেল। কলেজ-ইস্কুলে-পড়া ভাই আর বোন। এতদিন ছিল না; মুক্তিফৌজ এগিয়ে যাওয়ায় বুকে বল পেয়ে ওদের বাড়ির সবাই দিন দুই হল আবার গ্রামে ফিরে এসেছে।

মুচিপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে দেখলাম খাঁ খাঁ করছে ঘরবাড়ি। একটাতেও লোক নেই। দাওয়ার ওপর মাটির হাঁড়িকলসী। ধানের গোলাগুলো ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। খসিয়ে নেওয়া কাঠের জানলা-দরজাগুলো হাঁ হাঁ করছে।

এরপর ভোমরা গ্রামে এসে পৌঁছুলাম মুক্তিফৌজের এক ঘাঁটিতে। পরিত্যক্ত বাড়িটি কোনো এক সম্পন্ন চাষীর। উঠোনে কয়েকটা মরাই। পৈঁঠে-দেওয়া উঁচু দাওয়া। টিনের চালের মাথায় টিন কেটে লেখা "গোলাপ মিস্ত্রী ১৩৬৯ সাল ১লা বৈশাখ ভোমরা ধোনাই ভবন।"

ধোনাই ভবনে বসে থাকতে থাকতে মুক্তিফৌজের মর্টার ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত নুরুলের সঙ্গে আলাপ হল। নুরুল বললেন গ্রামে ঢুকবার সময় ডানদিকের প্রথম বাড়িটা লক্ষ্য করেছিলেন কি? ঈদের দু'দিন আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়ে গাঁয়ের এগারো জন লোককে দাঁড় করিয়ে খান সেনারা গুলি করে মেরেছিল। রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু গেলে এখনও তার দাগ দেখতে পাবেন।

গ্রামে এখন একটা বাড়িতেও লোক নেই। আজকাল অবশ্য পুরুষরা দিনের বেলায় এসে চাষবাসের কাজ করে দিন থাকতেই ক্যাম্পে ফিরে চলে যায়। মেয়েদের নিয়ে এসে সপরিবারে বসবাস করতে এখনও তাদের ভয়। খান সেনারা গাঁয়ে ঢুকে প্রথমেই টেনে নিয়ে যেত মেয়েদের। বলা যায় না, খান সেনারা আবার যদি ফিরে আসে।

গাঁ পেরিয়ে খেজুরবনের মধ্যে মর্টারের যে ঘাঁটি, নুরুলের উপরোধে

সেখানে যেতেই হল। যারা রাত জেগেছে, ছাউনির তলায় মাচার ওপর তখনও তারা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।
কোথাও সিগারেট, কোথাও ডাব, কোথাও চা—লড়াইয়ের ময়দানে বসেও আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি নেই। খুবই লজ্জা করছিল। কিন্তু ওঁরাও নাছোড়বান্দা।

তারপর মাঠ পেরিয়ে চৌবাড়ির উত্তরে সুবেদার জাহাঙ্গীর সাহেবদের ঘাঁটি। আর মাইল দুই পুবে গেলে মুক্তিফৌজের সবচেয়ে সামনের বাঙ্কার। জাহাঙ্গীর সাহেবরা এ বাঙ্কার খালি করে একেবারে সামনের ঘাঁটিতে কালকেই চলে যাবেন। এখন ওয়াকিটকিতে এই দুই ঘাঁটির যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
যেখানে ওঁদের বাঙ্কার, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল মাঠের মধ্যে একদল লোক ধান কাটাই-মাড়াই করছে। ওরা সব চৌবাড়ি গাঁয়ের লোক। ওরা কেউ গ্রাম ছেড়ে যায় নি।
পাক ফৌজের হাতে চৌবাড়ি গ্রামের কী দশা হয়েছিল তার গল্প বলল ঐ গ্রামের দাড়িওয়ালা রহিম বক্স গাঈন। পিঠটা দেখিয়ে বলল, সেপাইরা আমাকে কি রকম পিটিয়েছে দেখুন—আমাকে ওরা বলেছিল আমি নাকি মুক্তিফৌজের লোক।
সুবেদার মজিদ সাহেব এতক্ষণ ছিলেন না। এসে রহিম বক্সকে দেখে বললেন—ফটো তোলার গল্পটা এঁদের বলেছ?

গাঁয়ের সমস্ত মেয়েপুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাক ফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপেছিল এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে নি। পরে পাক ফৌজের হাতে-পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ

নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

রহিম বক্সের গলা ধরে গিয়েছিল বলতে বলতে। ওরা বাড়ির পর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর এ কাজে তাদের ডান হাত ছিল ঐ গ্রামেরই মাতব্বর গফ্‌ফর সর্দার! দিন কয়েক হল গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে গেছে। খান সেনারা হাটে হাটে এখন এই বলে ঢোল দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, চল্লিশ বছরের নিচে যাদের বয়স—পল্টনে নাম না লেখালে তাদের গর্দান যাবে।

তারপর একটু থেমে রহিম বক্স বলল, ওরা মানুষ নয়।

ট্রেনিং-পাওয়া তিনজন নতুন রিক্রুট বন্দুক হাতে নিয়ে এসে হাজির। তারা লড়বে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। লুঙ্গিপরা আবুল হোসেন আর ইউসুফ আলি চাষীর ঘরের ছেলে। আর সেই সঙ্গে প্যান্টপরা রবীন্দ্রনাথ সাহা। মিলে কাজ করত। ইস্কুলে পড়েছে। চোখের দিকে তাকালাম—ভয়ের চিহ্ন নেই।

চা-জলখাবারের পর্ব সারতে সারতে বেলা পড়ে এল। আরও ক্রোশখানেক রাস্তা এগোলে মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে আগুয়ান ঘাঁটিতে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু তাহলে আর সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা যাবে না। রাত্তিরে অবশ্য থেকে যাওয়া যায়। কিন্তু নানান দিক বিবেচনা ক'রে আমরা ঠিক করলাম ফিরে যাব।

বেলা পড়ে আসছে। ভাঁটার টানে খালের দুপাড়ে প্যাচপেচে কাদা। তার ওপর বাঁশের সরু সাঁকো। নদীর এপারে কারফিউ কাজেই সাতপাঁচ ভেবে তাড়াতাড়ি রওনা হতে হল।

ক্ষেতের আল দিয়ে দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে আমরা যখন পদ্মসাকরায় পৌঁছুলাম, সূর্য তখন ডুবছে। মাঠের মধ্যে ছড়াসুদ্ধ কাটা ধান। লোকবল কম। তাই একবারে নেওয়া যাচ্ছে না। ধারে কাছে

মুক্তি ফৌজ। কাজেই চুরি হওয়ার ভয় নেই।
দুপাশে রাশি রাশি খেজুরগাছ। গ্রামের ধারে কাছের গাছগুলোতেই সবে দা-কাটা দাগ। বাড়ির আশপাশে দুচারদিন আগে বোনা সরষের চারাগুলো সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে।
কিন্তু এবারের ধান মানুষের বোনা নয়। প্রকৃতিদত্ত। আগের বছরের ছড়ার ধান থেকে আপনাআপনি ফসল ফলেছে।
অটোমেটিক রাইফেল হাতে আমাদের যিনি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, মুক্তিফৌজের সেই সৈনিকটি বললেন এবারে নাকি ধান হয়েছে অটোমেটিক। কেননা চাষ করা তো আর সম্ভব হয় নি।
পদ্মসাকরায় ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই গত দুতিন দিন হল ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে। দেখে চেনবার জো নেই যে, কদিন আগেও এরা ছিল লক্ষ লক্ষ নিঃসম্বল হতভাগ্য শরণার্থীর দলে। চোখেমুখে আতঙ্কের লেশ নেই।
উঠোনে স্তূপাকার ধান।
রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেখলাম একটি পরিবার গ্রামে ফিরছে। এক ছেলের হাতে টিনের সুটকেস। এক মেয়ের হাতে পুঁটুলি। মার কোলে শিশু।
একটা হানাবাড়ি যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠছে।

সব্জিক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে। ক্ষেতটা পেরুতেই ছুটতে ছুটতে ছুটতে এল ছোট একটা মেয়ে। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধার হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগল। চাচা, আমাদের বাড়িতে চলো। কাল যাব ব'লে চাচাকে কথা দিতে হল। চাচা এ গাঁয়ের লোক নয়। বাড়ি তার কুমিল্লায়। ঈ-পি-আরের দেশভক্ত সৈনিক।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—ঐ যে দেখছেন, ওটা ছিল আমাদের বাঙ্কার। এ গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে সেই সময় আমাদের আলাপ। ঠিক ওর মত আমার এক মেয়ে আছে কুমিল্লায়।

জোয়ারের জলের কাদা ভেঙে নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে সীমান্তের এপারে এসে পানিতরের গ্রামে ঢুকতে যাব, ঠিক সেই সময় তিনবার মর্টার ছোঁড়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল নুরুলের মুখ। যে মুখ ঘৃণায় বিকৃত নয়, ভালবাসায় উজ্জ্বল। যেদিকে নুরুলদের রেখে এসেছিলাম পেছন ফিরে সেইদিকে তাকালাম। আকাশে লাল চন্দনের ফোঁটার মত চাঁদ আলো ফেলে সেই শত্রুদের সনাক্ত করছে—যারা মানুষ নয়।

মুক্তিফৌজের শিবিরে পৌঁছে শুনি খাবার তৈরি করে সাড়ে তিনটে থেকে তাঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা না আসায় সমস্ত ঘাঁটিতে টেলিফোন ক'রে খবর নিয়েছেন।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঝোলাঝুলি কাঁধে ফেলে ফেরী পার না হলে আমরা আর সে রাত্রে ফেরবার বাস পেতাম না।

বাসে আসতে আসতে দেখলাম হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সারবাঁধা নৌকোয় রাত্রিপ্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।

ক্ষমা ? ক্ষমা নেই

ব্যথা পেলে আমার লাগে। মানুষকে তাই ব্যথা দিতে স্বাভাবিকভাবেই আমার বাধে।

কিন্তু যশোরের আহম্মদ খানকে সামনে পেলে আমি তাকে নিজের হাতে গুলি করে মারতে পারি। কারণ, বিহারী আহম্মদ খান মানুষ নয়।

মণিরামপুরের মেহের আলী জল্লাদকে থানার হাজতে মুক্তিবাহিনীর লোকজনেরা যদি পাহারা দিয়ে না রাখত, তাকে আমি এক কোপে দুখানা ক'রে ফেলতে পারতাম। কারণ, বাঙালী মেহের আলীও মানুষ নয়।

মানুষ জবাই করার ঠিকা নিয়েছিল যশোরের আহম্মদ খান।

মণিরামপুরের রাজাকার দলের মেহের আলী একশো একটা মানুষ খুন ক'রে গোটা তল্লাটে জল্লাদ ব'লে নাম কিনেছে।

এরকম আহম্মদ খান আর মেহের আলী শুধু খুলনা-যশোরেই শ'য়ে শ'য়ে পাওয়া গেছে।

আহম্মদ খানকে হয়ত আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। যশোর ছেড়ে

খুলনায় যাবার সময় পাক ফৌজ তার সঙ্গীস্যাঙাৎদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সবাই খুলনা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি। পাক সেপাইরা মাঝপথে এল্ এম্ জি-র কিছু গুলি খরচ ক'রে তাদের ভার লাঘব করেছে।

মেহের আলী জল্লাদ বোধহয় ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল। রাজাকারদের খুলনাগামী দলটা থেকে সে কিছু লোকজন নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সমেত সময়মত স'রে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যেতে হল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে সে ধরা দেয় নি। তার দলের লোকেরা এখনও সশস্ত্র অবস্থায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

যে অবাঙালীরা পূর্ব বাংলায় বসবাস করত, বাঙালী সমাজে তাদের চলতি নাম 'বিহারী'। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সাপ্টাভাবে বলা হয় 'খান' কিংবা 'পাঞ্জাবী'।

স্বাধীন বাংলাদেশে বিহারী বা পাঞ্জাবী নিধনের ভয়ে যাঁরা তটস্থ হয়ে আছেন, তাঁদের আমি বলি মণিরামপুরে গিয়ে থানার হাজতঘরটা একবার দেখে আসুন। মেহের আলী জল্লাদ কিংবা শয়তানের জাস্থ দীন আলি কারিগরকে একবার নিজের চোখে দেখে আসুন।

দীন'আলি কারিগর। ষাট বছর বয়স। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের সে ছিল বডিগার্ড। মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা না পড়লে ও-তল্লাটের লোক তার গায়ের চামড়া খুলে নিত। দীন আলীর কাঁধে থাকত স্টেনগান আর হাতে পিস্তল। কত বাড়ি যে সে লুট করেছে আর পুড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পাক ফৌজ আর শান্তি কমিটির কর্তাদের ভোগের জন্যে সে বাড়িতে চড়াও হয়ে মেয়েদের ধরে আনত। বয়সের বাছবিচার ছিল না। এ পর্যন্ত কাছেপিঠে আঠারোটি ধর্ষিত

মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।

এই বয়সেও দীন আলীর লম্বা আঁটসাঁট মাঞ্জা-দেওয়া চেহারা। সাদা দাড়ি। সাদা বাবরি চুল। তাকে মাথা-ফাটা ক্ষতবিক্ষত দেহে দেখলে সত্যি বলছি আমি খুশি হতাম। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও মুক্তিবাহিনীর লোকদের পক্ষে তার উপায় নেই। কারণ কড়া নির্দেশ আছে—বিচারের ভার নিজেদের হাতে না নেবার। অপরাধীরা সাজা পাবেই—তবে নির্বাচিত গণআদালতে বিচার হওয়ার পর।

মেহের আলী জল্লাদ। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স। আগে ডাকাতি করে খেত। এ আমলে হয়েছিল রাজাকার। হাজত থেকে বার করার সময় তাকে ভয়-পাওয়া জন্তুর মত দেখাচ্ছিল। ঠোঁট দুটো নড়ছিল। বোধহয় বিড় বিড় ক'রে আপনমনে কিছু বলছিল। আল্লার নাম? ও বোধহয় ভেবেছিল ওকে বার ক'রে এবার কোতল করা হবে। কিন্তু কী রকমের মৃত্যুর রূপ সে কল্পনা করছিল? যেমন ক'রে এই ক'দিন আগে সে তার সমবয়সী মুক্তিযোদ্ধা আকরমকে মেরেছিল?

খানপুরের শেখপাড়ার আকরাম। মণিরামপুর থেকে দু আড়াই মাইল দূরে তাদের বাড়ি। চাকরি করত কুষ্টিয়ার কাছে দত্তনগরের সরকারী কৃষিক্ষেতে। গরিব চাষী পরিবারের ছেলে। সাত বোন এক ভাই। বিধবা মা। আকরামের রোজগারেই সংসার চলত। পঁচিশে মার্চের পর আকরাম মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দেয়। ও অঞ্চলের সবাই তাকে খুব ভালবাসত। মণিরামপুর বাজারে আমাকে একজন বলেছিল আকরাম ছিল হীরের টুকরো ছেলে।

আকরাম ধরা পড়ে যায় সামান্য একটু ভুলের জন্যে। সারা রাত হেঁটে আঠারোই অক্টোবর ভোরের আলোয় সে দুজন সঙ্গী নিয়ে বাড়িতে এসেছিল মা-র সঙ্গে দেখা করতে। একজন তার বন্ধু ইসমাইল আর

একজন তার ভাগ্নে আবুল নাঈম। ইসমাইলের বাড়ি ছিল বাখরায়। যশোরের টেকনিক্যাল কলেজে পড়ত। ওরা তিনজনে ছিল একই গেরিলা ইউনিটে।

মা রান্না চড়িয়েছিলেন। ঠিক ছিল, দুটো ভাত খেয়েই গ্রাম থেকে তারা রওনা দেবে।

হঠাৎ রাজাকারের দল এসে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। আকরাম আর ইসমাইল ওদের হাতে ধরা পড়ে যায়। আবুল উঠোনে লাফিয়ে পড়ে ছুট দেয়। রাজাকাররা এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু আবুলের গায়ে গুলি না লাগায় বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে সে পালিয়ে যায়।

রাজাকাররা আকরাম আর ইসমাইলকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মণিরামপুরের দিকে রওনা হয়। কিন্তু গ্রাম পেরোবার আগেই খালের ধারে নিয়ে গিয়ে তারা ইসমাইলকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে।

একা আকরামকে ধরে নিয়ে যায় থানায়। সেখানে হাজতের মধ্যে তাকে আট্‌কে রেখে মেরে মেরে সারা শরীর ফুলিয়ে দেয়। তবু আকরামের মুখ থেকে একটা খবরও তারা বার করতে পারে নি। সাত দিন জীইয়ে রাখার পর আট দিনের দিন সকালে তারা আকরামকে জানাল, তোমাকে আজ মারা হবে। আকরাম নির্বিকার। কিন্তু তখনও সে জানত না তার মৃত্যুর রূপটা কেমন হবে।

আগে থেকে কেটে এনে রাখা হয়েছিল তিনটি বাঁশ। বাঁশ তিনটি আকরামকেই বইতে বলা হল। বধ্যভূমি ঠিক হয়েছিল খানিকটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে। দুটো বাঁশ দিয়ে খুঁটি পোঁতা হল।

আকরামকে দিয়েই করানো হল খুঁটি পোঁতার কাজ। খুঁটির ওপর তৃতীয় বাঁশটাকে আড় ক'রে বসানো হল।

কাজ চুকিয়ে হাতের ধুলো ঝেড়ে নিল আকরাম।

বাজার থেকে দলে দলে লোক ধরে আনা হয়েছে হত্যাকাণ্ড দেখবার জন্যে। সামনের দিকে তাদের ভিড়। চোখে তাদের ভয়।

একমাত্র আকরামের চোখে কোনো ভয় নেই। আকরাম অকম্পিত গলায় জিগ্যেস করল, কে আমাকে মারবে?

হঠাৎ দেখা গেল মেহের আলীকে এগিয়ে আসতে। পরস্পরকে ওরা আগে থেকেই চিনত। আকরাম বলল, এসো তোমার সঙ্গে মোলাকাত করি।

মেহের আলী এগিয়ে এলে আকরাম তার সঙ্গে কোলাকুলি করল। তারপর বলল, একটু দাঁড়াও, আমি মোনাজাত ক'রে নিই।

মোনাজাত শেষ ক'রে মেহের আলীর দিকে তাকিয়ে আকরাম বলল, এবার আমি তৈরি। ব'লে বুক টান ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মেহের আলী একটু হাসল। হেসে বলল, তোমাকে তো গুলি ক'রে মারব না। পা ওপরদিকে ক'রে ঝুলিয়ে তারপর কাটব।

আকরাম বলল, ঠিক আছে।

ঝোলানো মানে দড়ির ফাঁসে পা বেঁধে নয়। পাঁঠার গোড়ালিতে লোহার শিক ফুটিয়ে যেভাবে ঝোলানো হয়, অবিকল সেইভাবে আকরামকে মাথা নিচু ক'রে ঝোলানো হল। আকরাম চেঁচায় নি। ঝোলানো অবস্থায় সমানে মোনাজাত পড়েছে।

মেহের আলী পাকা জল্লাদ। তার হাতের কাজে কর্তারা বেজায় খুশি ছিল।

হাতে তার চকচক করছে একটা ছোরা। সেই ছোরা দিয়ে সে প্রথমে

আকরামের হাতের মাংসপেশী কুচ কুচ করে কেটে নিল। যারা দেখছিল তারা অনেকেই চোখ নামিয়ে নিল যাতে দেখতে না হয়। আকরাম চেঁচাচ্ছে না। সমানে মোনাজাত ক'রে চলেছে।

মেহের আলী কাটা মাংসের টুকরো হাতে নিয়ে আকরামের মুখের সামনে ধ'রে বলল এই ছ্যাখ। বলে মাংসের টুকরোটা একটু দূরে একটা কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিল। শুধু হাত নয়। শরীরের যেখানে যেখানে মাংসপেশী আছে কেটে কেটে সেই একই দৃশ্যের পুনরভিনয় হল।

তারপর ছোরাটা পেটের বাঁ দিকে বসিয়ে ডান দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। আস্তে আস্তে আকরামের মোনাজাত করার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এরপরই ছোরাটা বসিয়ে দেওয়া হল বুকের বাঁ দিকের পাঁজর বরাবর আকরামের জ্ঞান ততক্ষণে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আকরামের গলার শেষ শব্দটা থেমে গেল মেহের আলীর ছোরায় আকরামের গলার নলীটা হাঁ হয়ে যাবার পর।

কাজ শেষ করে ছোরার গা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে মেহের আলী বীরবিক্রমে চলে গেল থানার হাতায়।

খবর পেয়ে আকরামের লাশ নিয়ে যেতে এসেছিল খানপুরের গ্রামবাসীরা। তাদের বলা হল, ঐ লাশ এখন কয়েকদিন ঐখানে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দয়া ক'রে রাত আটটায় আকরামের লাশ গ্রামে নিয়ে গিয়ে মাটি দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এ ঘটনা কি সত্যিই ঠিক এই রকমই ঘটেছিল?

মণিরামপুর বাজারে যান। এ ঘটনার কয়েক উজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আকরামের লাশ নিয়ে গিয়েছিল তার গ্রামের লোক। ক্ষতবিক্ষত সেই লাশটাই সশরীরে এই নিষ্ঠুরতার প্রত্যেকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

এ কাহিনী আমি শুনেছি বাজারের লোকজনদের কাছে। পরে শুনেছি আকরামের স্বগ্রামবাসীদের কাছে।

এ ঘটনার পুরো বিবরণ শোনবার আগে থানায় আমি মেহের আলীকে দেখি। তার মুখে আর মাথায় বেত মারার কয়েকটা দাগ দেখেছিলাম। চারপাশে সবাই বলেছিল, মেহের আলী ধরা পড়েছে শুনে গ্রাম থেকে আড়াই মাইল রাস্তা ছুটে এসেছিলেন আকরামের মা। একটা বেত কুড়িয়ে নিয়ে মেহের আলীকে তিনি সপাং সপাং ক'রে মেরেছিলেন।

খানপুর থেকে ফিরে আমি যদি মেহের আলীকে আরেকবার হাতের কাছে পেতাম আমি কী করতাম বলতে পারি না।

ক্ষমা? ওরা মানুষ নয়। ওদের ক্ষমা নেই।

এক নির্দয় দয়েল পাখি

আগের আগের দিন রাত্রে মোমবাতির আলোয় সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ব'সে আমি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' পড়ছিলাম। আমার মাথায় তখন একটা আইডিয়া ঘুরছিল— জীবনানন্দের বাংলাদেশ নিয়ে একটা ডকুমেণ্টারি ছবি করার। ইমেজ ইণ্ডিয়া-র জ্যোতি রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমার ইচ্ছের কথা বলায় জ্যোতি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। রাত্রে ব'সে ব'সে আমি তাই জীবনানন্দের কবিতা থেকে চিত্রকল্পের মালা গাঁথছিলাম।

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর···' এই কথাগুলো পেরিয়ে আসবার পর আমার চিত্রনাট্যের বাঁদিকের স্তম্ভে লিখলাম : 'অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে/ভোরের দয়েল পাখি—।'

ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্‌-এর মুক্তিযোদ্ধা হক সাহেব ব'সে গল্প করছিলেন। লেখা থামিয়ে হক সাহেবকে আমি জিগ্যেস করলাম—

আচ্ছা হক সাহেব, এদিকে দয়েল পাখি দেখতে পাওয়া যায় ?
কুমিল্লার লোক হলেও বেশ কিছুদিন তাঁর কেটেছে যশোর ক্যান্টনমেন্টে। বললেন, নিশ্চয় পাবেন।
জ্যোতিকে জিগ্যেস করলাম—ভোরবেলা, ডুমুরগাছ, বড় পাতার নিচে ব'সে থাকা দয়েল পাখি, এসব কি ক্যামেরায় তোলা সম্ভব ?
ক্যামেরাম্যান সত্যবাবু বললেন, নিশ্চয় সম্ভব।
বিজ্ঞাপন কোম্পানির আংশিক সময়ের চাকরিটা আসবার ঠিক আগে রাগ ক'রে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।* কাজেই ডকুমেন্টারি ছবি তোলার ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ তোলপাড় করছিল। নইলে শুধু বই লিখে তো আর সংসার চালাতে পারব না।
দয়েল পাখি দেখতে কেমন ? কিছুতেই মনে পড়ছিল না। আরও খানিকক্ষণ লেখালিখি ক'রে মোমবাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।
তার ঠিক একদিন পরে সকালবেলায় যশোর শহরের উপকণ্ঠে ইঁটখোলার মাঠে নাকে কাপড় দিয়ে হক সাহেব হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখুন, দয়েল পাখি।'
দয়েল পাখি! হ্যাঁ, সত্যিই দয়েল পাখি। আশপাশের গ্রামের লোকজনও তাই বলল।

একটা দয়েল পাখি। মানুষের অর্ধভুক্ত একটা শবদেহের ওপর ব'সে তার গা থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল কৃমি। কয়েক হাত দূরে আরেকটা শবদেহ। তন্ময় হয়ে তার পায়ের দিকটা ছিঁড়ে খাচ্ছিল একটিমাত্র কুকুর। আমরা খুব কাছে নাকে রুমাল দিয়ে দাঁড়িয়ে। জোরে জোরে কথা বলছি। দয়েলপাখি কিংবা কুকুরটার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

* ফিরে এসে দশচক্রে এখন আমি পুনর্মূষিক।

চারদিকে তাকালাম। অনেকখানি দূরে মাঠের মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছে একদল কুকুর। ধারে কাছে চিল বা শকুনের কোনো চিহ্ন নেই। একজন বলল, আগে আগে আকাশ কালো ক'রে শকুনের দল ঘুরে বেড়াত। খেয়ে খেয়ে মানুষে এখন ওদের অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু বাড়ির পোষা কুকুরগুলো এখন আর বাড়ির ভাত খায় না। তারা দিনরাত মাঠে ঘাটে ঘুরে মড়া খেয়ে বেড়ায়।
ইটখোলার মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শহরের ময়লানিকাশের বাঁধানো একসার নর্দমা আর গর্ত। রাস্তার ঠিক ধারেই স্তূপাকার হয়ে রয়েছে কয়েক ডজন মাথার খুলি। পাক ফৌজ থাকার সময় গাছের গায়ে দড়ি টাঙিয়ে মাথার খুলির মালা টাঙানো থাকত। যাবার আগে সেসব মুণ্ডমালা ওরা খুলে নিয়ে এদিকে সেদিকে খালে বিলে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠাঁইনাড়া করতে গিয়ে যে কয়েকটা মাথার খুলি গাড়ির তলায় গড়িয়ে পড়েছিল, সেই কয়েকটাই এখন রাস্তার ধারে দেখতে পাওয়া যাবে।

একটা কথা ব'লে রাখা ভাল—সাতক্ষীরা কিংবা যশোরে যেসব জায়গায় নরকঙ্কাল কিংবা শবদেহ স্তূপাকারে ছড়িয়ে আছে, আমি তার একটা কি দুটো জায়গার বেশি দেখি নি। সঙ্গে গিয়ে দেখে আসার জন্যে গ্রামের লোকজনেরা টানাটানি করেছে। কিন্তু দুটো একটা জায়গার বেশি আমি যাই নি। যেতে ইচ্ছে করে নি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা মনে আছে। সে সময় মেদিনীপুর আর বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। লোকে যেখানেই ডেকে নিয়ে গেছে গিয়েছি। দুর্ভিক্ষ মহামারীতে মৃত মানুষের মিছিল দেখে সেদিন যত না কষ্ট পেয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশি মন খারাপ হয়েছে এবার মানুষের হাতে নিহত মানুষের হাড়ের পাহাড় দেখে। তাই

মানা অছিলায় এবার গ্রামশহরের বধ্যভূমিগুলো এড়িয়ে গিয়েছি। একেবারে এড়ানো সম্ভব নয়। যশোরে এসে পৌঁছুনোর দিন সার্কিট হাউসের ভেতরে গাড়ি রেখে আমরা সবে নেমে দাঁড়িয়েছি, বন্দুকধারী একজন মুক্তিসেনা আমাদের ডেকে বললেন, এই গ্যারেজটার পেছনদিকে একবার আসুন। পেছনে যাওয়ামাত্র নাকে রুমাল চাপা দিতে হল। ইঁট চাপা দেওয়া একটা গর্তের ভেতর থেকে গন্ধ আসছিল। গর্তের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা ছেঁড়া কাপড়, লুঙ্গি আর গেঞ্জি। তার তিন হাত দূরে বাঙ্কারের মুখে কয়েকটা বালির বস্তা। তার গায়ে ভন্ ভন্ করছে মাছি।

ইঁটখোলার আশপাশে ময়লানিকাশী গর্তগুলো বাসি মড়ায় ঠাসা। নর্দমাগুলোতে মানুষের কাটা হাত, কাটা পা। চোখ খুলে তাকাতে কষ্ট হয়।

কাদের মৃতদেহ এসব? পাক ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মরেছে? ধরা-পড়া মুক্তিবাহিনীর লাশ?

না। এরা সবাই ছিল গ্রাম আর শহরের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। সাহসী বীর নয়, ভয়কাতুরে সাধারণ ছাঁ-পোষা মানুষ। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা ছিল বাঙালী। বাংলায় কথা বলত। তারা খুন হয়েছে শুধু বিভাষীর হাতে নয়, একই ভাষাভাষী রাজাকারদের হাতেও তাদের মরতে হয়েছে।

এরা মরেছে কিভাবে? লাইন বেঁধে গুলি ক'রে? না। গুলি খরচ ক'রে মারা হয়েছে খুবই কম ক্ষেত্রে।

সাড়ে পনেরো আনা লোককে করা হয়েছে জবাই। মুর্গিকে যেমনভাবে জবাই করা হয়। গলায় একটুখানি ছুরি চালিয়ে তারপর ছেড়ে দেওয়া। ঝটপট ঝটপট ক'রে লুটোপুটি খাবে। তারপর মরবে।

কিন্তু মানুষের জান তো। অত সহজে—

যেমন আফসার হাফিজ। তাঁর কথা শুনেছিলাম সাতক্ষীরার মাইল চার-পাঁচ আগে মামুদপুরের কশাইখানায়।
কশাইখানা বলতে সত্যিকার কশাইখানা নয়। আগে ছিল ইস্কুলবাড়ি। পাক ফৌজ আর রাজাকারদের হাতে পড়ে লোকমুখে ইস্কুলবাড়িটার নতুন নাম হয়েছিল কশাইখানা।
এই কশাইখানায় খুন-হওয়া ঐ এলাকার তিন হাজার জনের মধ্যে একজন ছিলেন চৌবেড়ের প্রবীণ ধর্মপ্রাণ মানুষ আফসার হাফিজ। তাঁকে ধরে এনে দিনের বেলায় ইস্কুলের সামনের উঠোনে জবাই ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়। সারা রাত শুয়ে শুয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি কলমা পড়েছেন। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে গাঁয়ের লোকে শুনেছে। পরদিন সকালেও তিনি বিড় বিড় ক'রে কলমা পড়ছিলেন। তারপর তাঁকে যখন গর্ত খুঁড়ে শুইয়ে দেওয়া হল, তখনও তিনি কলমা পড়ে যাচ্ছিলেন। শুধু মাটি চাপা দেবার ঠিক আগের মুহূর্তটাতে দুহাত দিয়ে তিনি তাঁর চোখদুটো ঢেকে দিয়েছিলেন।

যশোরে আহম্মদ খানের ইঁটের ভাঁটার দক্ষিণ পশ্চিমে আরেকটি ইঁটের ভাঁটা। তাহের আলীর। এখানেও সেই একই দৃশ্য। গর্তের মধ্যে পচাগলা শবদেহ। মাঠের মধ্যে ইতস্তত মড়া ছিঁড়ে খাচ্ছে তিন-চারটে ঘাড়ে-গর্দানে হওয়া কুকুর। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে টুকরো কাপড়, লুঙ্গি, গেঞ্জি। নতুনের মধ্যে শুধু একটা উলে-বোনা পুলওভার। কিন্তু আশ্চর্য, এক পাটি জুতোও কিন্তু কোথাও পড়ে থাকতে দেখি নি।
সাতক্ষীরার বাজারে একদিন যখন দোকান দেখে বেড়াচ্ছিলাম, তখন

ইকবাল বলেছিল—খান সেনারা সবার আগে ঢুকত জুতোর দোকানে। পাকিস্তানে জুতোর দাম বেশি ব'লে বাংলাদেশে পা দিয়েই ওরা জুতোর খোঁজ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে এসে গিয়েছিল—তা বাংলাদেশ ওদের জুতিয়েছে ভালই।

তাহের আলীর ইঁটখোলায় আসবার রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউ টাউনের উত্তরে বাহাদুরপুরের লুৎফর রহমানের সঙ্গে। বছর কুড়ি বয়স। রক্তহীন ফ্যাকাসে চেহারা। একজন তার শার্টের বোতাম খুলে ডান কাঁধের দিকে কণ্ঠার হাড়ের কাছটা দেখাল। ডুমো ডুমে হওয়া ক্ষতবিক্ষত দাগ। ঘা এখনও পুরো শুকোয় নি। তার পাকিয়ে-যাওয়া দুর্বল শরীরটার দিকে তাকিয়ে খুব মায়া লাগছিল।

ছোরা না বেঅনেট?

উঁহু।

ব'লে এবার পিঠের দিকে দেখাল দুটো ফুটোর দাগ।

লুৎফরকে ওরা গুলি ক'রে মারতেই চেয়েছিল। একা লুৎফরকে নয়। একসঙ্গে চল্লিশ জনকে। গুলি খেয়েও কপালের জোরে বেঁচে গিয়েছিল চারজন। সেই চারজনের একজন লুৎফর।

চাষীর ছেলে লুৎফর। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হাল দিয়েছিল মাঠে। তারপর বীজ বোনার পালা। পয়লা বৈশাখ সকালবেলা গাঁসুদ্ধ লোক যে যার বাড়িতেই ছিল।

হঠাৎ বাহাদুরপুর গ্রামে এসে হানা দিল চব্বিশজন পাক সেপাই। লুৎফরকে তারা গ্রামের রাস্তাতেই পাকড়াও করেছিল। বলেছিল কোন্ কোন্ বাড়িতে হিন্দুরা থাকে দেখিয়ে দাও। লুৎফর বলেছিল, হিন্দু যারা ছিল তারা অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তাই বলে লুৎফরকে তারা ছাড়ে নি। বাঙালী মুসলমানদের বাড়িতে

বাড়িতে ঢুকে জোয়ান-মরদ চল্লিশ জনকে ধ'রে তারা গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে নিয়ে গেল।

তারপর তাদের লাইন বেঁধে কি দাঁড় করিয়ে দিল?

না।

কনুইতে ভর দিয়ে তাদের শুয়ে পড়তে বলা হল।

তারপর সামনে থেকে গুলি করল?

না।

গুলি করল পেছন থেকে।

লুৎফরের পিঠে দুটো ফুটো সেইজন্যেই।

গুলি দুটো বেরিয়ে গিয়েছিল কণ্ঠার হাড় ভেঙে। গুলি লাগার পর লুৎফরের যে খুব যন্ত্রণা হয়েছিল তা নয়। পুরো হুঁশ ছিল লুৎফরের। সে দেখতে পেল যারা দু-দুটো গুলি খেয়ে আধমরা হয়ে কাতরাচ্ছিল, তাদের কাছে এসে পাক সেপাইরা আরও দু-চারটে গুলি ক'রে তাদের চিৎকার বন্ধ করে দিচ্ছিল।

লুৎফর তাই দেখে একেবারে মড়ার মত ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল। সেপাইরা চলে যাবার আধঘণ্টা পরে লুৎফর তার ক্ষতস্থানে গেঞ্জি গুঁজে দিয়ে কোমরকমে টলতে টলতে গ্রামে ফেরে। গ্রামে ঢুকবার মুখে প্রথম যে বাড়ি, সেই বাড়িতে এসে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একটানা ছ' মাস।

ম্লানমুখে লুৎফর বলল—ডান হাতটা এখন আর আমি ওঠাতে পারি না। কেমন করে আর চাষের কাজ করব, বলেন তো?

ইটখোলার ভেতর কাঁচা কবরগুলো দেখছিলাম। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি কাঁধে ঝুলি নিয়ে একজন চশমাচোখে বুড়ো ইটের পাঁজার গায়ে দাঁড়িয়ে। বলল, আমার বৃত্তান্তটা একটু লিখে নেন।

কী নাম?

কালাই শেখ।

বয়স কত ?

আশী।

কালাই শেখ থাকতেন বাহাদুরপুর গ্রামে জামাইয়ের বাড়িতে। জামাই করত চাষের কাজ। আর ঐ গ্রামেই কালাই শেখের ছেলের একটা ছোট দোকান ছিল। সেপাইরা বাহাদুরপুরে ঢুকে দোকানটা লুঠ করে। কালাই শেখের ছিল সারা জীবনের জমানো সত্তরটা টাকা। সেটাও তারা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। আর যাবার সময় ধ'রে নিয়ে যায় তাঁর ছেলে আর জামাইকে। গুলি খেয়েও জামাই কোনরকমে প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু জীবনে আর সে চাষের কাজ করতে পারবে না। দুটো হাতই তার অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু গুলি খেয়ে মারা গেছে কালাই শেখের অন্ধের নড়ি ছেলেটা। দিনের খানিকটা সময় কালাই শেখ ছেলের দোকানে গিয়ে বসতেন।

এখন ?

জামাইয়ের সংসারও তো অচল। কালাই শেখকে তাই বুড়ো বয়সে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষেয় বেরোতে হয়।

কত লোক খুন হয়েছে এ তল্লাটে ? কে হিসেব রাখে তার!

ওয়াপদার যে রেস্টহাউসে আমরা ছিলাম, সেখানকার ঝাড়ুদার সুখলাল ডোম বলল,—তা কম করে সাত হাজার তো হবেই। মড়া ফেলার কাজ তাকেও করতে হয়েছে। পয়সা দেয় নি। মড়া ফেলার জন্যে দিয়েছে আটা আর তেল।

রাজাকার কত ছিল ?

এক সাতক্ষীরা মহকুমাতেই পঁচিশ হাজার। বাড়িতে চাল টাকা ঘুষ দিয়ে রাজাকার দলে লোক জোটানো হত। কেউ এসেছে অভাবে, কেউ লোভে, কেউবা অত্যাচারের হাত থেকে বাড়ির

লোকদের বাঁচাতে পারার আশায়। মাস মাইনে নব্বই টাকা।
কিন্তু অনেকেই এই মওকায় কামিয়ে নেবার জন্যে লুটপাট করে মাসে পাঁচ ছ'শো টাকা রোজগার করেছে।
আর পাক সেপাইরা ?
সাতক্ষীরার কাছে এক বাঙ্কারের ধারে মুক্তিফৌজের হাতে নিহত এক পাক সেপাইয়ের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল নগদ সতেরো হাজার টাকা। লোকে বলে, পাক সেপাইরা নাকি ডাকঘরগুলো থেকে মাথা পিছু প্রতি মাসে পাকিস্তানে কমপক্ষে দু-তিন হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট্ পাঠাত।

আর সেই দয়েলপাখি ?
বড় হৃদয়হীন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আমার জীবনে। আমি কি আর আমার কবিতায় কোনদিন শান্তভাবে দয়েলপাখির কথা বলতে পারব ?

ভয় নেই

আমি যখন যুধ্যমান বাংলাদেশে, আমার মেয়ে পুপে তখন দক্ষিণ কলকাতার এক ইস্কুলে প্রাইভেটে স্কুল ফাইনালের টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছিল।

ফিরে এসে বাড়িতে পুপের গল্প শুনলাম। হলে ব'সে একটি মেয়ে টুকছিল। তাতে ওরা আপত্তি করে। মেয়েটি চটে গিয়ে ওদের শাসায়—পরীক্ষার শেষদিনে তোমাদের দেখে নেব। বন্ধুরা ঘাবড়ে গেলে পুপে তাদের সাহস দেয়—কিস্যু হবে না, দেখিস। ও হল সপ্তম নৌবহর।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমি তখন যশোর-খুলনা রোডে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। রেডিওতে খবর দিয়েছে, মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে ভিড়েছে। তখনও প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে দৌলতপুরে। ক্যাম্পে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালাম। না। কেউ বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছে ব'লে মনে হল না। কিন্তু রেগে আগুন হয়ে গেছে।

ভয় না পাবার একটা কারণ ছিল। রেডিওতে বলেছিল, সোভিয়েতের

নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেছে।
পুপের গল্পটা শুনে খুব হেসেছিলাম। সপ্তম নৌবহর নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যেই শুধু নয়। আসলে এর মধ্যেও একটা টোকার ব্যাপার ছিল বলে। ধাড়ি নিক্সন নকল করছিলেন চীনকে।

পঁচিশে মার্চের ঘটনা যখন ঘটে, আমি আর সাজ্জাদ জহীর তখন উত্তর ভিয়েতনামের এক গ্রামে। হ্যানয়ে পা দেওয়ামাত্র ডক্টর শেলভাঙ্কর হোটেলে ফোন করলেন—খবর আছে, এক্ষুনি চলে এসো।
পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু খবরের একমাত্র সূত্র বি-বি-সি কিংবা ভয়েস অব আমেরিকা।
সাজ্জাদ জহীর উত্তর ভারতের লোক। প্রথম যৌবনেই ব্যারিস্টারি ছেড়ে সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট কর্মী হন। দেশভাগের পর তিনি হয়েছিলেন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। আত্মগোপন ক'রে থাকার সময় পাক পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পাক সরকার তাঁকে ফাঁসী দেবার উপক্রম করেছিল। আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের জোরে ছাড়া পেয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, এ বিষয়ে আমরা ছিলাম নিঃসংশয়। সাজ্জাদ জহীর পশ্চিম পাকিস্তানকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আমারও কিছুটা জানা ছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে আমাদের বিশ্বাসের আরও একটা জমি ছিল। সে জমি উত্তর ভিয়েতনাম। একটা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা চাইলে দুনিয়ার সবচেয়ে জবরদস্ত শক্তিও তার কাছে হার মানে। আমাদের পায়ের নিচে ভিয়েতনামের মাটি, আমাদের চোখের সামনে ভিয়েতনামের মানুষই ছিল তার প্রমাণ।

আরও একটা ভরসা ছিল। সে ভরসা হল সোভিয়েত দেশ। তারও প্রমাণ মিলেছিল ভিয়েতনামের মাটিতে। জানতে বুঝতে যাচাই করতে সময় লেগেছে, কিন্তু সময়মত হাত বাড়াতে তার দেরি হয় নি। তাই বলে ভয় কি পাই নি কখনও? বার বার পেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস হারাই নি।

পেট্রাপোলের রাস্তায় যখন দেখেছি বাঁধভাঙা বন্যার মতন শরণার্থীরা আসছে—প্রায়ই ভেবেছি এবার আমরা ডুবে যাব। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে উদ্ধারকারীও যেমন ডুবে যায় সেইভাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রচুর নাকানিচুবানি খেয়েছি বটে, কিন্তু আমরা কেউই ডুবে যাই নি।

নবাগত শরণার্থীকে জিগ্যেস করেছি, কেন চলে এলেন? বলেছে, মুসলমানরা তেড়িয়ে দিয়েছে। লড়াইয়ের কথা গ্রামে থাকতে সে জানতে পারে নি, জেনেছে শিবিরে এসে। দেখেছে তারই মতন অন্য গ্রাম থেকে দলে দলে এসেছে সর্বস্ব হারিয়ে মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান। ধর্মের বন্ধনের জায়গা নিয়েছে ভাষার মেলবন্ধন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থেকেছি। প্ররোচনার অভাব হয় নি। কিন্তু তাতে কোথাও কোথাও বড় জোর দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। কিন্তু সবাই সজাগ থাকায় ঘটনা বেশিদূর গড়াতে পারে নি।

পেট্রাপোল শিবিরের সেই কর্মাধ্যক্ষের কথা ভুলব না। শরণার্থীর অন্তহীন ভিড়ে যখন নিজের স্নানখাওয়াও মাথায় উঠেছে, তখন তিনি দেখালেন ক্যাম্পের ছাত্রদের জন্যে যাতে বইখাতার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্যে ওপরে তিনি চিঠি লিখেছেন। বললেন, ক্যাম্পে পড়াবার মাস্টারের অভাব হবে না। তাছাড়া আমরা যা খেতে দিই তাতে আধপেটাও হয় না। কাজের মধ্যে থাকলে তবু ওরা খানিকক্ষণ

ক্ষিধের কথাটা ভুলে থাকতে পারবে। তাঁর রিটায়ার করার প্রায় সময় হয়ে এসেছে। কাজ দেখিয়ে তাঁর চাকরির ভবিষ্যৎ ভালো হবে, সে আশাও ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এপারের মানুষকেও ছুঁইয়ে দিয়েছিল আগুনের স্পর্শমণি।

কলকাতার কত লোককে বলতে শুনেছি, এই রিফিউজির দল কি ভাবছেন আর ঘাড় থেকে নামবে? ওরা কেউই আর ফিরে যাবে না।

সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা—এটা গুণ বটে। কিন্তু একবার বাতিক হয়ে গেলে সে রোগ সারানো মুশকিল।

মুক্ত অঞ্চলের গ্রামে শরণার্থীরা ফিরে যাচ্ছে এ দৃশ্য আমি দেখে এসেছিলাম ভারতে পাক আক্রমণেরও আগে। তেসরা ডিসেম্বর। এরপর এগারোই থেকে সতেরোই সাতক্ষীরার রাস্তায়, যশোরের অলিগলিতে দেখেছি সাইকেল রিক্সায়, ট্রাকের মাথায় লোক আসছে তো আসছেই। ঢাকা আর খুলনার মুক্তির পর ভয়সংশয় ঘুচে গেছে। পুঁতে রাখা মাইন, অগ্নিদগ্ধ কিংবা ধূলিসাৎ ঘরবাড়ি, লুট-হওয়া দোকানপাট আর আসবাবপত্র, বন্ধ ইস্কুলকলেজ, আপিস আদালত—সমস্যা অনেক।

সাতক্ষীরার গায়ে কুমোরপাড়ায় মাটির বাড়িগুলোর একটাও আর দাঁড়িয়ে নেই। সারা পূর্ব বাংলায় এদের তৈরি পুতুলেরই ছিল সবচেয়ে বেশি নামডাক।

গ্রামের রাস্তায় কালীপদ দে-র সঙ্গে দেখা। ঠিকেদারি ক'রে তাঁর ভালো রোজগার ছিল। একতলা হলেও বেশ বাহারে দালান ছিল। এখন সেটা বিরাট একটা ইঁটের স্তূপ। দেখতে এসেছিলেন বাড়িতে ফেরা যাবে কিনা। সাইকেল হাতে ভগ্নমনে শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে

যাচ্ছিলেন বসিরহাট। বললেন, ফিরে তো আসতেই হবে। কাজ-কারবার সবই তো আমার এখানে।

এক জোরবরাতের গল্প শুনেছিলাম মণিরামপুরে। একজন হিন্দুর একটা একতলা পাকা বাড়ি ছিল। পালিয়ে গেলে এক বিহারী সেটা দখল ক'রে নেয়। পাক ফৌজ চলে গেলে ভদ্রলোক ফিরে এসে দেখেন এর মধ্যে তাঁর একতলা বাড়ি হয়ে গেছে তিনতলা। ইলেকট্রিক ছিল না, ইলেকট্রিক হয়েছে। জবরদখলকারী তো পাক ফৌজের সঙ্গেই তল্লাট ছেড়ে হাওয়া।

যশোরে থাকতে থাকতেই দেখছিলাম বেশ কয়েকটা বাড়ির বন্ধ জানলাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে।

একটু ভেতরদিকে এমন গ্রামও ছিল যেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দুবাড়িতে কর্তাগিন্নীরা থেকে গিয়েছিলেন। পাড়াপড়শীরা তাঁদের আগলে রেখেছিলেন। গ্রামের রাজাকাররাও তাঁদের গায়ে হাত দেয় নি।

একদিন সকালে দেখি থানার সামনে ট্রাকের ওপর বেজায় ভিড়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর বাড়ির বউঝি। একজনকে জিগ্যেস করলাম, এরা কি সব বাড়ি ফিরে আসছে? বললে, আজ্ঞে না, এখানকারই লোক। মাথাপিছু তিন টাকা দিয়ে বনগাঁ দেখতে যাচ্ছে।

কলকাতায় আমি এমন লোক দেখেছি যারা মানতেই চাইত না মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব। কিংবা বলত ওরা তো সব ঈ-পি-আর আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভাড়াটে সৈনিক।

বড় রাস্তা আর গ্রামগঞ্জের পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে দেখতাম পিল পিল ক'রে কাতারে কাতারে ফিরে আসছে গেরিলা বাহিনীর লোকজন। খালি পা, গায়ে গেঞ্জি কিংবা শার্ট, পরনে লুঙ্গি কিংবা হাফপ্যান্ট।

কাঁধে রাইফেল, হাতে স্টেনগান। বেশির ভাগই চাষী ঘরের ছাত্র কিংবা চাকুরে। যশোরের রাস্তায় দু'জনের সঙ্গে দেখা। একজনের খুলনায় ছিল লণ্ড্রি, আরেকজন ছিল ইস্কুলের ছাত্র। 'জয় বাংলা' বলে হাত বাড়িয়ে দিল। দু'জনেরই হাতে খোসপাচড়ার দাগ। আমাকে আগেই একজন বলেছিল, খোসপাচড়ার দাগ দেখলেই বুঝবেন গেরিলা বাহিনীর লোক। পুষ্টিকর খাবার পায় নি, তার ওপর ময়লা জলকাদার মধ্যে পড়ে থাকতে হয়েছে।

ত্রিমোহিনীতে দেখা হয়েছিল আনিসুর রহমানের সঙ্গে। যশোরের এম-এম কলেজে অর্থনীতিতে অনার্সের ছাত্র। বরণডালিতে বাড়ি। আনিসের দাদা ইসাহাক ছিলেন সরকারী কৃষি ফার্মের চাকুরে। দিনে তাঁর হাতে থাকত কলম। রাত্রে তিনি মুক্তিসেনা—শত্রুদের লক্ষ্য ক'রে অন্ধকারে তাঁর হাতে গর্জে উঠত বন্দুক কিংবা গ্রেনেড। ও-অঞ্চল মুক্ত হওয়ার আগে কেউই সে খবর জানত না।

মুক্তিবাহিনীর আট নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর মেহবুবকে স্যালুট ক'রে এক গাল হেসে যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগেও সে ডাকাত ছিল। তার নাম রাজ আলী দফাদার। একান্ন বছর বয়স। হাসলেই তার ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তার স্থাবর অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি প্রায় কিছুই ছিল না। থাকবে কী ক'রে? সব সময় কি আর কাজ হত? কিন্তু দলের লোকদের তো বারো মাস খাওয়াতে পরাতে হত। আর তাছাড়া চারপাশে এত অভাবী লোক, চাইলে তো আর না বলা যেত না। রাজ আলী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর ঠিক করেছে জীবনের বাকি দিনগুলো সৎপথে থেকে তার এতদিনের ডাকাত নামটা খণ্ডাবে।

খোর্দো গ্রামে আমাদের রাস্তা আটকেছিল গেরিলা বাহিনীর

ছেলেরা। সরকারী মাল্টিপারপাসের আপিস ঘরে এখন মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি। পাক বাহিনী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের সব কাজ সম্মিলিতভাবে তারাই চালাচ্ছে।

এ গ্রামের বীর কিশোর এখন মৈনুদ্দিন। একা ছ'জন শত্রুকে ঘায়েল করেছে। তার মুখে চোখে কোথাও এতটুকু হিংস্রতা নেই। হাসিটা ভারি মিষ্টি। ক্লাস নাইনে পড়ত। ন'জন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। খানেরা ওকে দিয়ে ইঁট বওয়াত। পয়সা তো দিতই না। তার ওপর একদিন ওকে সাত ঘা বাড়ি মারে। সেইদিনই সে বর্ডার পেরিয়ে চলে যায়। তার মনে হয়েছিল খান সেনাদের মেরে না তাড়ালে কিছুতেই তার মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচবে না। মৈনুদ্দিনের ছিল এমন অসমসাহস যে পাক সেনাদের বাঙ্কারে চড়াও হয়ে শত্রু নিপাত করতে তার বুক একটুও কাঁপে নি।

আমি যাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশে দিনরাত কাটিয়েছি, তাঁরা অধিকাংশই ঈ-পি-আরের লোক। মুখ বেঁকিয়ে কেউ তাঁদের ভাড়াটে সৈনিক বললে সে অপমান আমার নিজের গায়েই বাজ। রক্ষীদলে নাম লেখাতে হয়েছিল জমিজমার অভাবে, পেটের দায়ে। পাক বাহিনীতে বাঙালী পুলিশপল্টনকে দেখা হত ছোট নজরে। জাত তুলে গালাগাল আর অপমান করা ছাড়াও, অনেক অধিকার আর সুযোগ-সুবিধে থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ডাক আসতেই যে যার বন্দুক নিয়ে তাঁরা লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জান দিতেও তাঁরা কসুর করেন নি। মাইনে-করা পুলিশপল্টন স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রবলে হঠাৎ যে কী আশ্চর্য চেহারায় দেখা দিতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। হক, জাহাঙ্গীর, মজিদ, নূর ইসলাম—এমন সব মানুষদের নিয়ে বাংলাদেশের যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, সে মুক্তিবাহিনী পৃথিবীর যে কোনো সংগ্রামী দেশেরই

গর্ব হতে পারত।

নতুন ক'রে তৈরি হচ্ছিল কদমতলায় ব্রিজ। মুক্তিবাহিনীরই তত্ত্বাবধানে। নায়েক সুবেদার আতাউর রহমান গল্প বলছিলেন, দলবল নিয়ে খান সেনাদের এই ঘাঁটিতে ক'বার কিভাবে তাঁরা অন্ধকারে হান দিয়ে তাদের খতম করেছিলেন। বুলেটে হঠাৎ বেকায়দায় জখম হয়েছিলেন দিন পঁচিশ আগে। ভোমরা সেক্টরে সকাল সাড়ে ন'টায় ট্রেঞ্চ কাটবার সময়। গুলি ডানদিক থেকে বাঁদিকের পাঁজর ভেদ করে যায়। হাসপাতালে বলেছিল এক মাস শুয়ে থাকতে। কিন্তু দশ-বারো দিন পরেই ফিরে আসেন ইউনিটে। দলে লোক কম ছিল যে।

মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউ টাউনের পাশ দিয়ে আসছিলাম। দু'পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। হঠাৎ দেখি কয়েকটা পানসিগারেট আর মুদির দোকান খোলা। দুটো গলিতে দেখলাম রোদ্দুরে ভিড় করে ছেলে-মেয়েরা খেলছে। পোশাকে অবাঙালী ব'লে বোধ হল।

শহরে এসে শুনলাম এখনও এখানে সেখানে অবাঙালীরা রয়ে গেছে। সেদিন বিকেলেই শহরের প্রধান সড়ক আর-এন রোডের এক বস্তীর পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম হিন্দীতে কয়েকজন মেয়েপুরুষ কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ না করে দলে দলে রাস্তার লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মুক্তিসেনাদের ঘাড়ে ঝোলানো রাইফেল।

এরপরও কি ভয় করতে হবে?

এইবার হাসি ফুটুক

আমার লেখা পড়ে অনেকেই নাকি চোখের জল ফেলেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, এ ধরনের লেখা এখন না বার হওয়াই ভালো, কারণ তাতে মানুষ উত্তেজিত হবে। এর জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে, যাঁরা কেঁদেছেন তাঁদের একটুখানি হাসিয়ে আবহাওয়াটাকে আমি একটু হালকা করে নিতে চাই।

প্রথম গল্প :

পাক ফৌজ রাস্তায় রাস্তায় কড়া নজর রেখেছিল যাতে কেউ অস্ত্রশস্ত্র কিংবা দামী জিনিস সরিয়ে ফেলতে না পারে।

নিশ্চিন্তে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক। হাত দেখিয়ে গাড়িটা থামানো হল। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। ততক্ষণে একজন গাড়ির পেছনে গিয়ে বন্ধ ডালাটা খুলে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার : আরে ব্যস্, মেশিনারি লেকে ভাগ্ তা! (গাড়িটা ছিল জার্মান ফোক্সভাগন, যার ইঞ্জিন থাকে পেছনদিকে।) ভদ্রলোক তাঁর সিগারেট কেসটা খুলে ঠিক সেই সময় পাক সুবেদারের

দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেপাইয়ের কথাটা সুবেদারের কানে যাওয়ামাত্র—

দ্বিতীয় গল্প :

পাক ফৌজ বাড়ি বাড়ি ঢুকে সার্চ করছিল। মুজিবের ছবি আছে কিনা খুঁজছিল।

দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়ে জিগ্যেস করল : ইয়ে কৌন্ হ্যায় ?

(সর্বনাশ ! রবীন্দ্রনাথের ছবি।) গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বললেন : মেরা দাদা হ্যায়।

কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে যে (সর্বনাশ করেছে !)। ঘাড় অবধি চুল। একমুখ দাড়ি। গৃহস্বামী মনে মনে তখন আল্লার নাম করছে।

উও বহুৎ আচ্ছা আদমি হ্যায়, বহুৎ শরীয়তী আদমি হ্যায়। (যাক বাবা ! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।)

পাশে আরেকটা। পাক ফৌজ কাছে সরে গেল। (সর্বনাশ ! নজরুলের ছবি !)

কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দাড়ি নেই। গোঁফ পর্যন্ত কামানো।

ইয়ে কৌন্ হ্যায় ?

গৃহস্বামীর গলায় ততক্ষণে জোর এসেছে। হেসে বললেন ; মেরা নানা হ্যায়।

বহুৎ খারাব আদ্‌মি, বহুৎ বেশরীয়তী আদ্‌মি।

গৃহস্বামীর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাক ফৌজ কিছু না বলে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকল।

পর পর তিনটি বাড়িতে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি এবং পুনরভিনয় হল।

শুধু চতুর্থ বাড়িতে গিয়ে তাদের বলতে শোনা গিয়েছিল, সব শালা বাঙালী লোককো এক হি দাদা, এক হি নানা হ্যায় ? তারপর পরিবার-পরিকল্পনামতে 'তিনের বেশি নয়' নীতিতে তারা সেই চতুর্থ গৃহস্বামীকে তাঁর ঘরের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ—

তৃতীয় গল্প :

একজন পাক সেপাই পানের দোকানে পান কিনছিল। (থুড়ি, 'কিনছিল' বলেছি হাতের কাছে অন্য কথা না পেয়ে। আসলে পাক সেপাইরা দোকান থেকে যা নিত, তার জন্যে কখনই পয়সা দিত না।) দোকানদার পান সেজে যখন এগিয়ে দিচ্ছে, তখন হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেপাইটি জিগ্যেস করল ; ইস্‌মে কেয়া হ্যায় ?

চুনা, সুপারি ঔর জোয়ান হ্যায়।

জওয়ান ?

আর কোনো কথা নয়। হাত থেকে পানটা ফেলে দিয়ে আরেব্বাপ বলতে বলতে সেই পাক সেপাইটি সঙ্গে সঙ্গে.....

পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, গল্পগুলোর শেষে আমি কি রকম হুঁশিয়ার হয়ে গল্পের পরিণতি অনুযায়ী আলাদা করে ড্যাশ আর ডট ব্যবহার করেছি। যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয়। সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। ড্যাশ ব্যবহার করেছি যাতে হাসতে গিয়ে পাঠকদের গলায় হাসি আটকে না যায়। বীভৎস রস সৃষ্টির জন্যে যাঁরা মুখে বা মনে মনে আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন, তাঁদের মন রাখার জন্যে এই বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা।

অভিযোগের জবাবটাও এই সঙ্গে দিই।

যাঁরা বলেছেন যে, আমার লেখা পড়ে লোকে উত্তেজিত হবে, তাঁদের কথা শুনে আমি হেসেছি। আরেকটু দুর্বিনীত হলে আমি তাঁদের মুখের ওপর বলতাম—মশাইরা, যান। তাড়াতাড়ি গিয়ে গ্রাম শহর মাঠঘাট পুকুর-খাল-নর্দমা-কুয়ো থেকে পচাগলা লাশ আর মাথার খুলি, মড়ার হাড় চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ-হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে রাতারাতি বাড়ি তুলে ফেলুন। গাছে চড়ার লোক না পেয়ে ডাব খাওয়ার জন্যে পাক ফৌজ যে গাছগুলো গোড়া কেটে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো চটপট মাটিতে খাড়া করে দিন। সোনাদানা টাকা পয়সা আর লুটের মালগুলো খুঁজে বার করে যথাস্থানে পৌঁছে দিন। নইলে উত্তেজনার খোরাকগুলো কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রত্যেকটি মানুষের চারপাশে আজ উত্তেজনার পর্বতপ্রমাণ একেকটি বারুদখানা। কাগজের লেখা থেকে তাদের উত্তেজনা সংগ্রহ করতে হবে না। তাছাড়া ক'জন মানুষই বা সেখানে কাগজ পড়তে পারে।

এ পর্যন্ত আমি আমার একটা লেখাতেও বাংলাদেশে হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সত্যের কথা বলি নি। তার কারণ, লিখতে গিয়ে লজ্জায় আমার কলম থেমে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো সৈন্যবাহিনী, এমন কি নাৎসীরাও এমন ব্যাপক হারে বাড়ি বাড়ি ঢুকে নারীধর্ষণ করে নি। শুধু ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পর হত্যা। ধর্ষণের পর সবাইকে মেরেছে তা নয়। বড় একটা দলকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে তারা নিজেদের বেশ্যালয় খুলেছিল। বেশ্যাদেরও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে ; এরা ছিল খাঁচায় বন্দী। শুধু পেটভাতায় জোরজুলুমের শিকার। কাউকে কাউকে চালান করে দিয়েছে পাকিস্তানে। (পশ্চিম পাকিস্তান বললে বাংলাদেশের মানুষেরা চটে যান। বলেন,

পশ্চিম পাকিস্তান শুনলেই মনে হয় যেন পূর্ব পাকিস্তান ব'লে এখনও কিছু আছে! পাকিস্তান মানেই এখন পশ্চিম পাকিস্তান।) পাক ফৌজ ধর্ষণ করে মৃত মনে করে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে।

আজও বেঁচে আছে এমন ধর্ষিতা মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। মণিরামপুর বাজারে একজনের মুখে শুনেছিলাম তাঁর এক চেনা মেয়ের কথা। ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল। কলেজে পড়ত। এখন তার দিকে তাকানো যায় না। শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে তার চেহারা। একেবারে বুড়িয়ে গেছে। সব সময় কাঁদে।

এর মধ্যে বেশ বড় একদল ছিল ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে। কনভেন্টে-পড়া এমনি এক উচ্চশিক্ষিত মেয়ের কথা শুনেছিলাম থানায় বসে। যিনি বলেছিলেন তিনি পাক আমলে ছিলেন জেলার ডি-এস-পি। মেয়েটির বাবা খুব নামকরা এফ-আর-সি-এস ডাক্তার। তার দাদা জার্মানিতে ভালো চাকরি করে। পাক ফৌজ বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সর্বনাশ হওয়ার পর মেয়েটি যখন ফিরে এল, তার বাবা পরের দিনই এদেশের পাট উঠিয়ে মেয়েকে নিয়ে সপরিবারে ছেলের কাছে জার্মানিতে চলে গেলেন।

কত মেয়ে মরে নি কিন্তু বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

এখনও বেঁচে আছে এমন একজনের নামঠিকানা পেয়ে গিয়েছিলাম। টেঁকেরহাটে গিয়ে নূর ফার্মেসিতে খোঁজ করার কথা। যখন পৌঁছুলাম সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ। চারদিকে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। একজন বলল, একদল সশস্ত্র রাজাকার এদিকে পালিয়ে এসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেখান থেকে

দৌলতপুর মাইল কুড়ি। জোর লড়াই হচ্ছে তখনও। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল গোলাগুলির মাটি কাঁপানো আওয়াজ। আমাদের কারো কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। সুতরাং মানে মানে আমরা সরে পড়লাম।

তার মানে, আমার কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নেই—অথচ জোর গলায় আমি বলছি, পৃথিবীতে পাক ফৌজের মত এমন অসভ্য ঘৃণ্য সৈন্য বাহিনী-ইতিহাসে এর আগে আর দেখা যায় নি। আমি তার নির্ভরযোগ্য এক প্রমাণ দেব এ লেখার একেবারে শেষে।
মাথার খুলি দেখিয়ে মৃতের প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু ধর্ষণের প্রমাণ? মিলতে পারে একমাত্র জীবিত মেয়েদের স্বীকারোক্তিতে। তেমন সাহস ক'জনের হবে? আমি শুনে'ছলাম টেঁকেরহাটের সেই মেয়েটি হয়ত রাজী হতেও পারে। পাক ফৌজ তাকে ধর্ষণ করেছিল যশোর থেকে পশ্চাদপসরণের পথে।
আমার একমাত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ, আমার একমাত্র দলিল হল মাত্র দু'চারটি গ্রাম শহরের অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তারা প্রত্যক্ষদর্শী; তারা তাদের চেনাজানা লাঞ্ছিত মেয়েদের সমস্ত খবর রাখে। ঘরের মেয়েদের এমন চরম অসম্মানের কথা কেউ কখনও বানিয়ে বলবে, বিশ্বাস করেন? এ কি শুধু সেই মেয়েদেরই লজ্জা? গ্রাম আর শহরের বেঁচে-থাকা বাপ ভাই স্বজনবন্ধু—গোটা পুরুষ সমাজের লজ্জা নয়?

এই সঙ্গে আমি আমার একটা ভয়ের কথা বলি। নিষ্ঠুরতা আর অপরাধের মজুত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো অবিকলভাবে অবিকৃত অবস্থায় থাকবে তো?

মামুদপুরের সেই কশাইখানার সামনে এক গ্রামবাসী একটা প্রকাণ্ড কাটারি দেখিয়ে বলেছিল, এই দেখুন, এই দিয়ে এখানে মানুষ কাটা হত।

আমি বলেছিলাম, ওটা কিন্তু যত্ন করে রেখে দেবেন। পরে জাদুঘরের জন্যে দরকার হতে পারে।

কিছুদিনের মধ্যেই কশাইখানা বদলে গিয়ে আবার সেখানে ইস্কুল বসবে। যে রকম দেখে এসেছি সে রকম তো আর থাকবে না। গন্ধগুলো মাটিচাপা পড়বে। রক্তের দাগগুলো ধুয়ে ফেলা হবে। দেয়ালের গুলির দাগগুলো চুনবালিতে ঢেকে যাবে। কিন্তু ইতিহাস? দলিলে, ফটোচিত্রে, টেপরেকর্ডে কি তা ধরে রাখা হবে না?

মাথার খুলি আর মড়ার হাড় এর মধ্যেই অনেক খোয়া গেছে। আমাকে একজন বলল এসব জিনিসেরও নাকি নানা রকমের বাজার আছে।

সাতক্ষীরা শহরে লোকের মুখে মুখে শুনেছিলাম ডায়মণ্ড হোটেলের কথা। কুখ্যাত ডায়মণ্ড হোটেল। এটা ছিল রাজাকারদের ঘাঁটি। লোক ধরে এনে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে এখানে দেওয়া হত প্রাথমিক ধোলাই। তারপর সাফ করা হত কশাইখানায় নিয়ে গিয়ে। এখানে যখন কাজ হত, রাস্তা দুদিক থেকে আটকে দেওয়া হত। কিন্তু আশপাশের বাড়ির লোকে কানে আঙুল দিয়েও আর্ত চিৎকারের হাত থেকে রেহাই পেত না।

তার ক'টা বাড়ি পরেই ডাক্তারখানা। ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধী ইকবালের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। ইকবাল আর্টিস্ট। ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে গত ক'মাস বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার একজন মিষ্টিমত অল্পবয়সী ছেলে। তার বাবাকে গ্রাম থেকে ধরে এনে ঐ ডায়মণ্ড হোটেলেই রাজাকাররা

প্রথমে ধোলাই এবং পরে সাফ করে।

ওদের দুজনকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে হোটেল দেখতে গেলাম। নিচে ছিল রাজাকারদের আড্ডাখানা। গদিওয়ালা চেয়ার সোফা ছিটিয়ে বিটিয়ে আছে। দোতলায় দেখলাম কড়িকাঠ, যেখানে ঝোলানো হত।

বাড়িওয়ালা এসে গেলেন। পাঁচ ছ'বছর আগেও ছিলেন ইণ্ডিয়ায়। বোধহয় বছর বত্রিশ তেত্রিশ বয়স। এই কম বয়সে এত কম দিন এসে পেল্লায় বাড়ি হাঁকিয়েছেন বলতে হবে।

তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। দেখবার মত বাহ্য নিদর্শন বিশেষ কিছু ছিল না। মেঝের ওপর পড়ে ছিল একটা খালি ফাইল। জিগ্যেস করলাম, রাজাকারদের কাগজপত্রটত্র ছিল নাকি?

ছিল বৈকি। সব আমি তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

বাড়িওয়ালার বিবেচনা আছে। ভাবতে ভাবতে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের কয়েকটা বাড়ি থেকে হোটেলের দোতলার হলঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। নিচে রাস্তার দিকে তাকালাম। রাস্তার ঠিক ধারে খোলা ড্রেন। ড্রেনের মধ্যে অনেক কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে। একধারে কাগজ জড়ো করে পোড়াবার চিহ্ন। কৌতূহল হল।

নিচে নেমে এসে ড্রেনের ভেতর ঝুঁকে পড়ে তাকালাম। অনেকগুলো কাগজে নামের লিস্ট। স্ট্যাম্পের ওপর সই-করা কাগজে টাকা নেওয়ার রসিদ। কার সই? মল্লিক বলে একজনের সই। দেখেই ইকবাল লাফিয়ে উঠল। এ ছিল রাজাকারদের পাণ্ডা। মুক্তি বাহিনী ওকে ধ'রে আটকে রেখেছে। গাঁ থেকে দলে দলে মেয়েরা থানায় এসে ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে গেছে। কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাড়িওয়ালাকে দেখানো হলে তিনি বললেন, বাজে কাগজ বলে ওসব ফেলে দিয়েছি। ডাকিয়ে আনা হল থানার ও-সিকে। তিনিও অম্লান-বদনে বললেন, নিশ্চয় বাজে কাগজ—তাই উনি ফেলে দিয়েছেন। আমি বলবার অধিকারী নই। বাইরের লোক। তবু বলতেই হল, সব এখন রেখে দিয়ে বাছাইয়ের কাজটা তো পরেও হতে পারে। বড় দারোগা তখন বাড়িওয়ালাকে বললেন, তাহলে আর এসব ফেলবেন না। তালা বন্ধ করে সব নিজের হেপাজতে রেখে দেবেন। একেই উটকো লোক হয়ে আমার পক্ষে যা বলার নয় তা বলেছি। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেলাম।

এবার সেই অকাট্য প্রমাণটা দেব। অত মার্কিন-চীন অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়েও আত্মসমর্পণ করতে পাক ফৌজের কত দিন লেগেছে? পুরো দু-সপ্তাহও নয়। বাংলাদেশে তারা পা দিয়েছে মাত্র ন'মাস আগে। কিন্তু বাংলাদেশে তাদের জারজ সন্তানেরা এরই মধ্যে ভূমিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। যেদিন তারা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালায় সেইদিনও পালাবার রাস্তায় মেয়েদের তারা ধর্ষণ করেছে। তাদের বাঙ্কারের ধ্বংসস্তূপেও পাওয়া গেছে নারীদেহ। দেখেশুনে মনে হয়, তারা যেন বাংলাদেশে এসেই ছিল লুট আর নারীধর্ষণ করতে। এমন যে নরাধম সৈন্যবাহিনী তারা কি লড়াই করতে পারে? তাদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণই তাদের ঘৃণ্য অপরাধের অকাট্য প্রমাণ।

রাত্রে যশোর থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত গাড়িতে করে যিনি আমাদের আসবার দিন এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি খুব মজার লোক। দু' দুটো চা-বাগানের মালিক। পাক আমলের এই পুরো সময়টা তিনি প্রকাশ্যে ঢাকাতেই ছিলেন। প্রায়ই তিনি আসতেন সাতক্ষীরায়।

শহরে রাখতেন গাড়ি। তারপর? তারপর গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায়। অসমসাহসী এই মানুষটি ছিলেন ঢাকার সঙ্গে নির্বাসিত স্বাধীন বাংলাদেশের নিয়মিত যোগসূত্র। এতদিন কাকপক্ষীও টের পায় নি।

যেতে যেতে ষ্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় হঠাৎ পেছনদিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তারপর আমাকে বললেন, কাল সন্ধ্যের পর খুলনা থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে গ্রামের মেয়েরা ছেলে কোলে করে নির্বিকারভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। গাড়ির রাস্তায়। সন্ধ্যের পর। মেয়েরা একা একা। পাশ দিয়ে হুস্ হুস্ করে যাচ্ছে মিলিটারি। ভারতীয় জওয়ান। তারপর আবার পেছন ফিরে বললেন, এ আপনি ভাবতে পারেন? তাঁর গলা আবেগে ভারাক্রান্ত।

এ ধরনের কিছু দেখা দৃশ্য আমারও মনে পড়ল। উনি বলবার আগে এ ব্যাপারটাতে আমি ততটা গুরুত্ব দিই নি। বলতেই হবে, বাংলাদেশের মানুষেরা ভারত আর ভারতীয় জওয়ানদের সম্পর্কে আমার বন্ধ চোখ খুলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি এই প্রথম ভারতীয় বলে গর্ব অনুভব করেছি। ভারত শুধু তার সীমান্ত খুলে দেয় নি, সেইসঙ্গে তুলে দিয়েছে ভাষার বেড়া। যে দশ হাজার ভারতীয় জওয়ান বাংলাদেশের জন্যে রক্ত দিয়েছে—তারা বহু ভাষাভাষী ভারতের মানুষ।

আর আমি সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে বাংলাদেশে ঢুকব না। এবার যখন যাব বাংলাদেশের সীমান্তে সগর্বে দেখাব আমার ভারতীয় ছাড়পত্র। এবার আর কান্না নয়। আমি এবার দেখতে চাই সুখেশান্তিতে বাংলাদেশের হাসিমুখ।

ভাই জহির রায়হান

ভাই জহির,—

আমার সে স্পর্ধা নেই যে তোমাকে সান্ত্বনা দেব। যেমন আমি সান্ত্বনা দিতে পারি নি শেখপাড়ার আকরামের মা-কে। তোমার কথা বার বার আমার মনে পড়ছিল কবে, জানো? যেদিন পাক ফৌজ ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে।

আমি তখন যশোরে।

এরোপ্লেনের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম মাথার ওপর দিয়ে, ঢাকার দিকে উড়ে যাচ্ছে সাদা রঙের একটা প্লেন। আমরা যখন মণিরামপুরে তখন সেই প্লেনটাকেই ফিরতে দেখেছিলাম। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল যেন তোমার তোলা আগামী দিনের কোনো ডকুমেণ্টারি ছবি দেখছি।

আমার সে আশা আরও জোর পেয়েছিল যখন সেদিনই সন্ধ্যেয় রেডিওর খবরে শুনলাম তুমি তোমার ইউনিট নিয়ে ঢাকায় রওনা হয়ে গেছ। পরে শুনলাম রাস্তায় গাড়ির গোলযোগে দমদমে প্লেন ধরতে

না পারায় তুমি পৌঁচেছিলে পরের দিন।

আমি তখনও যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি। ভাবছি আমাকে হঠাৎ ঢাকায় দেখতে পেয়ে তুমি কি রকম অবাক হয়ে যাবে। পাক ফৌজ তখনও খুলনায় অস্ত্র ত্যাগ করে নি। শহরটাকে তারা ভেঙেচুরে শেষ করছে। গর্ত থেকে ইঁদুর বার করে মারার মত বাড়ি বাড়ি ঢুকে তারা বাঙালীদের খতম করছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে সশস্ত্র বেইমানের দল কেউ গ্রামের দিকে, কেউ দরিয়ার দিকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছে। ফরিদপুরে, রাজবাড়িতে তখনও ঘাঁটি করে আছে পাক ফৌজ। ভাটিয়াপাড়ার বাঙ্কারগুলো থেকে রাস্তার ওপর সমানে গোলাগুলি ছুঁড়ছে পাক ফৌজ আর রাজাকার বাহিনী। কাজেই যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়ার রাস্তা তখনও বন্ধ। দু-তিন দিন অপেক্ষা করলে হয়ত যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু একটা দিনের মধ্যে যশোরে ঢাকাযাত্রী বহু উৎকণ্ঠিত লোকের ভিড় জমে যেতে দেখলাম। কারো স্ত্রী-পুত্র, কারো বাবা মা ভাইবোন এতদিন শত্রুর কবলের মধ্যে ছিল। এই ক'মাস কে কেমন আছে কিংবা আছে কি নেই তারা জানে না। চোখের সামনে সেই উদ্বিগ্ন জনস্রোত দেখে আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এ যাত্রায় আর আমি ঢাকায় যাব না। কেননা আমার যাওয়া মানেই এদের কাউকে না কাউকে বঞ্চিত করা।

তাছাড়া সত্যি বলতে কি, ঢাকার চেয়ে বরং আমার ঢের বেশি টান চট্টগ্রামের ওপর! তার কারণ, আমার প্রথম ঢাকা দর্শন খুব সুখের হয় নি। কেন হয়নি বলছি।

ঢাকায় আমি প্রথম পা দিই আজ থেকে অন্তত আটাশ বছর আগে। আমি আর কমরেড জ্যোতি বসু সেবার একসঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন

পার্টি কমিউন ছিল সম্ভবত জি ঘোষের গলিতে। আমরা পৌঁছুবার খানিকক্ষণ পরই দেখলাম সেখান থেকে জনকয়েক লাঠিসোটা নিয়ে রণসাজে সেজে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, একটু বসুন—আমরা একটু বাদেই ঘুরে আসছি। সন্ধ্যের পর বিজয়গর্বে সবাই ফিরে এল। পরে শুনলাম কোনো এক বামপন্থী দলের ছেলেরা ক'দিন আগে আমাদের একজনকে ছুরি মেরেছিল। এক কালভার্টের ওপর লাঠির আগায় আজ তার বদ্‌লা নেওয়া হল।

সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে সেই সময় আমার প্রথম আলাপ। কিন্তু যার সঙ্গে তারও আগে কলকাতায় আমার প্রথম আলাপ—সেই সোমেন চন্দকে, জানি না জহির, আজও তোমরা মনে রেখেছ কিনা। কথাটা যেমনই শোনাক, তবু আমি বলব—আমাদের সমসাময়িক কমিউনিস্টদের মধ্যে বড় লেখক হাওয়ার উপাদান আর গুণ বোধহয় একমাত্র সোমেন চন্দেরই ছিল।

কিন্তু আমার প্রথমবার ঢাকায় যাওয়ার ঢের আগে রাস্তা দিয়ে সূতাকল শ্রমিকদের ফ্যাশিস্ট-বিরোধী মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় কমিউনিস্ট-বিরোধী এক বামপন্থী দলের হাতে সোমেন চন্দ খুন হয়। সোমেন চন্দের স্মৃতি রক্ষা করতে গিয়েই তো সেদিন সবাইকে মিলিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।

ঢাকায় পা দিয়েই বামপন্থীতে-বামপন্থীতে এই মারদাঙ্গার ভাব দেখে আমি একটু মিইয়ে গিয়েছিলাম।

তার ঠিক পরের দিন যে ব্যাপার ঘটল তাতে কোনো নবাগতের পক্ষে ঢাকা শহরকে ভালো লাগা একেবারেই সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে পার্টি অফিসে জেলা কমিটির মিটিং হচ্ছে। বেলা বারোটা নাগাদ খবর এল শহরে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেছে। হিন্দুমুসলমান কমরেডদের মিলিত একটি দল সেইদিনই আমাকে

পাহারা দিয়ে নিয়ে চলে গেল নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জকে দেখে কারো বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে, তার ঠিক গায়ের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হচ্ছে।

সুতরাং প্রথমবার ঢাকায় আমার থাকার মেয়াদ হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টারও কম। তাও পদে পদে ফাঁড়া। তবু সেই কম সময়ের মধ্যেও ভালবাসবার মতন, মানুষের জন্যে সর্বত্যাগী, কয়েকজন মানুষ পেয়েছিলাম। তাদের কারো কারো সঙ্গে দু-যুগ পরে এবার কলকাতায় দেখা হল। আজও তাঁরা রং বদলান নি; শুধু চুলগুলোই যা সাদা হয়ে গেছে। জেলখানার বাইরে, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে গত পঁচিশ বছরে এই প্রথম তাঁরা নিশ্চিন্তে প্রকৃতির দেওয়া খোলা আলোহাওয়া গায়ে লাগাবেন।

আমি কলকাতার ছেলে হলেও, তোমার কাছে স্বীকার না ক'রে পারছি না—জীবনে একবারই আমি ঢাকা শহরকে হিংসে করেছিলাম। ভাষা আন্দোলনের জমিতে দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী ক'রে প্রথম যেবার নির্বাচনে জিতেছিল যুক্তফ্রন্ট। তারপরই সাহিত্য সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসেবে আমরা একটা বড় দল কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম। সেবার ঢাকা শহরকে যে কী সুন্দর লেগেছিল বলবার নয়। শুধু নতুন নতুন বাড়ি, ঝলমলে আলোর জন্যে নয়। ভাষা আন্দোলন ঢাকা শহরের পাষাণে জাগিয়েছিল প্রাণের ফোয়ারা।

সেই প্রাণবন্ত শহরের কথা জীবনে কখনও ভুলব না। তখনও দেয়ালে দেয়ালে যুক্তফ্রন্ট লেখা আর নৌকো আঁকা। রিক্সাওয়ালারা সাইকেল চালাত যেন নৌকো বাইবার ভঙ্গিতে। সেই দিনগুলো আজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তোমার তখন নিতান্তই বালক বয়স। তোমার দাদা শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে আমার সেই সময় আলাপ।

যশোরে থাকতে মেহবুব বলেছিল—সুভাষদা, আর দুটো দিন থেকে যান। আমি আপনাকে ঢাকায় নিয়ে যাব। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা মেহবুবকে না জানিয়ে আমি যশোর থেকে চলে এসেছিলাম। ঢাকায় ফেরবার জন্যে ব্যাকুল যাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার লোভ সম্বরণ করেছিলাম।

ভাগ্যিস সেদিন যাই নি।

ফিরে এসে ঢাকার সেই মর্মান্তিক খবরটা কাগজে দেখলাম। লিস্টে শহীদুল্লা কায়সারের নাম। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল। কেননা ধরা পড়ার ভিত্তিতে যে সন্দেহ, শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি সত্যি নাও হতে পারে।

সকালে লেক গার্ডেনে গিয়ে দেখি বাড়িতে একা অপু আর তপু। সুচন্দা তোমাকে ফোন করতে গেছে হরিদের বাড়িতে।

গিয়ে দেখি কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে সুচন্দার মুখ। শাহরিয়ার জানাল, ঢাকা থেকে এসে একজন বলেছে—যেটা ভয় করা হচ্ছিল সেটা সত্যি বলে জানা গেছে।

যে গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। আমাদের সকলেরই তখন ভাবনা তোমাকে নিয়ে। কেননা তোমাকে মুঠোর মধ্যে পেলে ওরা যে কী করত, তা বাংলাদেশের সবাই জানে। কিন্তু পরাজিত ক্ষ্যাপা কুত্তার দল ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে অন্ধকারে এখন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও তোমাকে বাগে পেলে তারা ছাড়বে না। দাদার শোকের চেয়ে ভাই সম্বন্ধে এই ভয়ই সেদিন আমাদের সবাইকে

উতলা করেছিল। আমাদের তখন একমাত্র চিন্তা কি করে তোমাকে হুঁশিয়ার করা যায়। শাহরিয়ার, হরি আর সন্তোষ সেদিন সারাটা দিন টেলিফোনের সামনে বসে কাটিয়েছে।

জহির, তোমাকে এ চিঠি কেন লিখছি? দাদার শোকে সান্ত্বনা দিতে নয়। যদিও আমি জানি, শহীদুল্লা কায়সার তোমার জীবনে দাদার চেয়েও ঢের বড় কিছু ছিল। সুচন্দা কাঁদতে কাঁদতে তোমার সম্বন্ধে বলেছিল, দাদা নিজের হাতে ওকে গড়েছিলেন। ও আজ যা হয়েছে তার পেছনে আছেন দাদা।

যখন তোমাকে আমি চিনতাম না, তখন তোমার বই পড়েছিলাম—'হাজার বছর ধরে'। রেডিওতে সাহিত্যপাঠ প্রসঙ্গে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলেছিলাম, গরিব চাষীর জীবন নিয়ে লেখা এত ভাল বাংলা বই এর আগে আমি পড়ি নি। শুনে কত লোক যে ট্রামে-বাসে আমার কাছে বইটার খোঁজ করেছিল বলার নয়। বলেছিলাম, ও বই তো এখানে পাবেন না—পূর্ব পাকিস্তানের বই।

তুমি যে চিত্র-পরিচালক সে পরিচয় পেলাম অনেক পরে। আর তারও পরে জেনেছিলাম তুমি শহীদুল্লা কায়সারের ভাই।

চিঠি তো, কাজেই আর বড় করা যায় না। শেষ করবার আগে শুধু জানিয়ে রাখি, এর মধ্যে এক ফাঁকে 'জীবন থেকে নেয়া' দেখে এসেছি।

তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমার ভয় ছিল। হয়ত ঠিক মনের মত হবে না। আর যাই হোক, জঙ্গীশাহীর আমলে তোলা ছবি তো। কিন্তু হলে বসে আমার সমস্ত ভয় কোথায় ভেসে গেল। সমস্ত দর্শক একমন একপ্রাণ হয়ে গেছে তোমার ছবির সঙ্গে। তারা কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও রাগে ফুঁসে উঠছে। বিশ্রামের সময়,

সমাপ্তির পরও সবাই শুধু ছবি নিয়েই কথা বলেছে। আমি যে কখন সেই সাধারণের দলে এক হয়ে গিয়েছি, আমার খেয়াল নেই। বুকের ওপর যখন জঙ্গীশাহীর জগদ্দল পাথর, তখন গোপন রন্ধ্রপথে শুধু শ্বাস ফেলা নয়—শুকনো বারুদের স্তূপে স্ফুলিঙ্গ পৌঁছে দিয়ে তুমি শুধু বীরের সম্মান রাখো নি, শিল্প আর শিল্পীরও সম্মান রক্ষা করেছ। গল্প বলেছ ঘরের, কিন্তু সে ঘর সারা দেশের জায়গা জুড়েছে। আমি শুনেছি এ ছবিতে অনেক খুঁত আছে। নিখুঁত আর জলো ছবি দেখে দেখে আমরা ক্লান্ত। খুঁত থাকে থাকুক, এখন আমরা জীবনের একটু আগুন চাই।

ভাই জহির,—হরি ঢাকা থেকে ফিরে এসে বলল, তুমি নাকি এয়ারপোর্টে নেমেই ছবি তুলতে আরম্ভ করেছিলে। তারপর সারাদিন শহরের নানা জায়গায় ছবি তুলে যখন নিজের বাড়ির কাছে গেলে তখন সে বাড়ির দিকে নাকি তুমি তাকাতে পারো নি। সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়েছে।

তারপর তোমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল যখন তুমি ছুটতে ছুটতে দাদার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলে।

সেই প্রথম তুমি জানলে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক খবর—শহীদুল্লা কায়সার বেঁচে নেই।

না, জহির, আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব না।

এখনও অনেক শবদেহ মাঠেজলে কবরের অপেক্ষায়। এখনও অনেক নিহতের খোঁজ নেই।

এসো একদিন আমরা বাংলাদেশে সমস্ত বাঙালী আর ভারতীয় নিহত মানুষের স্মৃতিতে এপারে ওপারে আমাদের পতাকাগুলো অর্ধনমিত করি, শহর নিস্প্রদীপ করি, ঘরে ঘরে অরন্ধন পালন করি।

ছবি তুলতে তুলতে বাইরে থেকে ঘরে এসে তুমি শোকে স্তব্ধ হয়েছ, এবার সব কিছু নড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে বাইরে এসো।

দুই ঢিল, এক পাখি

গোড়ায় একটা কথা পরিষ্কার করে নিই। নইলে আবারও ঢিল পড়তে পারে।

এই বইয়ের প্রথম লেখা—'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই'—কাগজে বার হওয়ার পর ঐ লেখা এবং লেখককে আক্রমণ করে একটা চিঠি ছাপা হয়। তারপর তাই নিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে প্রসঙ্গটিতে হঠাৎ ধামা চাপা পড়ায় পত্রলেখিকার দ্বিতীয় চিঠিটিই কাগজে শেষ কথা বলার সুবিধে পায়।

আমার এই লেখাগুলো যাঁরা বইতে প্রথম পড়বেন, তাঁরাও বিতর্কের ব্যাপারটা যেন জানতে পারেন, তারই জন্যে চিঠিদুটো অতঃপর হুবহু তুলে দিলাম :

ক্ষমা ও ক্ষমাহীনতা প্রসঙ্গে

গত ২২ ডিসেমবর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "ক্ষমা—না-ক্ষমা নেই" শীর্ষক লোমহর্ষক রচনাটি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শুনেছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি—কোনো কবির কলম থেকে এ-রকম বীভৎস রচনা প্রকাশ হতে পারে তা জানতাম না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরকারী পুরস্কারও পেয়েছেন। তাই মনে

হয়, তিনি সরকারেরও আস্থাভাজন। কিন্তু ঠিক এই সঙ্কটকালে যখন ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার একযোগে দেশের উত্তেজিত জনগণকে শান্ত করতে উদ্যোগী, যখন ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ জনতা যাতে নিজের হাতে আইন নিয়ে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে তার জন্য সমস্ত দায়িত্বশীল মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, কারণ কে না জানে আজ যদি ভারতে বা বাংলাদেশে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে তাহলে পাকিস্তান ও তার বন্ধুদেরই সহায়তা করা হবে, তখন এই রকম একটি উস্কানিমূলক দুষ্কর্মে প্ররোচনা যোগাবার মত প্রবন্ধ কেনই বা একজন কবি লিখলেন এবং কেনই বা আপনাদের প্রসিদ্ধ দৈনিকে তা প্রকাশিত হল জানি না।

প্রবন্ধটির সত্যতাও প্রমাণযোগ্য নয়। লেখক পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখেছিলেন, তিনি বরজার থেকে দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন যশোরে গিয়েই তিনি এত তথ্য পেয়ে গেলেন? তিনি নিজে কতটুকু খোঁজখবর করেছেন? যদি সত্যই তাঁর হাতে প্রমাণ থাকে, তাহলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানালেই তার উপযুক্ত প্রতিবিধান হতে পারে। এভাবে গুজব রটালে ঐ ধরনের অপকর্ম করবার প্রবৃত্তিকেই জাগিয়ে তোলা হয়। যতক্ষণ যুদ্ধ চলেছে, ততক্ষণ অন্য কথা। আজ একটি প্রতিষ্ঠিত নবজাত সরকার যাতে তাদের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে, সেটাই হিতৈষীরা দেখুন। এরকমভাবে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুললে তাতে বিঘ্নই ঘটবে।

বস্তুত এই প্রবন্ধ লিখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাকে সাহায্য করলেন? ভারতকে? বাংলাদেশকে? না মানবতাকে? সুভাষবাবু, "ক্ষমা? ওরা মানুষ নয়! ওদের ক্ষমা নেই" বলতে কি বোঝেন ঠিক বুঝলাম না। ঐ বিশেষ ব্যক্তিগুলি মানুষ নয়, না বিহারী মুসলমানেরা মানুষ নয়, মুসলিম লীগের মানুষরা মানুষ নয়? পলিটিশিয়ান কবির উপযুক্ত বাণীই বটে। আমরা সামান্য লোক, মানুষে আস্থা রাখি। আমরা মনে করি, সব মানুষই অবস্থার ক্রীড়নক—তার মধ্যে দানব ও দেবতা একসঙ্গে বাস করেন, কোন্‌টিকে বাড়িয়ে তুলব, সেটা নির্ভর করে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর। এই আট মাস শরণার্থী শিবিরে শিবিরেই আমার বেশি সময় কেটেছে। আমি জানি, বহু বিহারী মুসলমানও হিন্দুর প্রাণ রক্ষা করেছে। বহু মুসলিম লীগের লোকও প্রতিবেশী হিন্দুকে আশ্রয়

দিয়েছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। মানুষকে 'ওরা' বলে চিহ্নিত করা ভুল আবার। সব জাতির মধ্যে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সব ভাষাভাষীর মধ্যে গুণ্ডা আছে এবং তারা সব সময় ছুরি দিয়েই মারে না—কলম দিয়েও মারণযজ্ঞ শুরু হয়। তার প্রমাণ আগেও পাওয়া গেছে।

—মৈত্রেয়ী দেবী: কলিকাতা-১৯।

হিংসা ও ক্ষমা

সুভাষবাবুর প্রবন্ধের উত্তরে আমার লেখা চিঠির অনেকগুলি প্রতিবাদ পড়লাম। এটা স্বাভাবিক। তাই কয়েকটি বিষয়ে আমার বক্তব্য একটু স্পষ্ট করতে চাই। প্রথমত 'ক্ষমা বা ক্ষমাহীনতা' শিরোনামা খুব সুন্দর হলেও আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিল নেই। ক্রূর-কর্মা জঘন্য অপরাধীদের ক্ষমা করার কথা আমি বলি নি। আমি বলতে চাই যথোপযুক্ত বিচারপূর্বক সরকার তাদের শাস্তি দেবেন। কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় দেখেছি, জনতা নিজের হাতে শাস্তির ভার নিলে নিরপরাধী শাস্তি পায়। অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। সেইজন্যই যখন সুভাষবাবু নিজের হাতে কাটতে চান তখন দুষ্কর্মে প্ররোচনা দিচ্ছেন বলেই মনে হয় এবং বার বার দুষ্কৃতিকারীদের নামের সঙ্গে জাতিগত বিশেষণটি ব্যবহার করলে দাঙ্গার উস্কানীও ঘটতে পারে।

পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ *হয়ত জানেন না যে, ব্যক্তিগতভাবে আমারও শরণার্থী শিবিরের সংবাদ কিছু কিছু জানা আছে, আমরা আজ ৬।৭ মাস এক অনাথ আশ্রম চালাচ্ছি। সেইসব কচি কচি শিশুরা কিভাবে তাদের বাপ মা-কে হারিয়েছে তা জানি। বহুবার বুলেটবিদ্ধ, বেয়নেটবিদ্ধ নরনারীকে শুশ্রূষা করবার সুযোগ আমাদের হয়েছে—একটি বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একজনকে পথ থেকে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পথে তার মর্মান্তিক কাহিনী শুনেছি। 'মামা-ভাগ্নে' ক্যাম্পে দুই পাটি দাঁত উৎপাটিত অবস্থায় এক যন্ত্রণাকাতর মানুষের চিত্ত-মহিমা দেখে মাথা নত হয়েছে। সেই মানুষটিকে দেখে সকলে যখন উত্তেজিত হয়ে উঠছে তিনিই সকলকে শান্ত করে বলেছেন, আপনারা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন, আমার এ অবস্থা করেছে ইয়াহিয়ার চররা—তাদের উদ্দেশ্য সফল করবেন না।

আবার জনতার কীর্তিও কম দেখি নি। স্পাই সন্দেহে কতো নিরপরাধ লোককে বধ করা হয়েছে, তার ঠিক নেই। চারটি ছেলে মুক্তি-ফৌজে যোগ দিতে আসছিল, তারা নিহত হয়েছে। হেলেঞ্চা ক্যাম্পে একটি নিরপরাধ চাষী নিজের গাঁয়ের লোককে খুঁজতে এলে আমার সামনেই প্রায় খুন হচ্ছিল, কোনো মতে রক্ষা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ সাবওয়ার্দ মুর্শেদের ছেলেকে ধরে প্রায় মেরে ফেলেছিল। এইসব কারণে আমাদের বিশ্বাস, জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলে তার প্রতিশোধ স্পৃহাকে বাড়িয়ে তুললে মঙ্গল হয় না।

তাছাড়া বীভৎস ঘটনার বর্ণনা লিখে বীর সৈনিক হওয়া যায় না। বীরত্ব বলতে আমরা বুঝি যখন কোনো বড় কাজের জন্য বা পরের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও কেউ কাজ করে বা প্রাণ দেয়—সেটা নিরাপদ ঘরে বসে খবরের কাগজে লিখে কি করে হয় তা বুঝলাম না। বিশেষত জনমত যখন তার অনুকূল। হিংস্রতা বীরত্ব নয়, হিংস্রতাকে জয় করতে পারাই বীরত্ব। কতগুলি লোক বীভৎস হিংস্র কাণ্ড করেছে বটে, কিন্তু তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিখে মানুষের মনকে হিংস্রতা সম্বন্ধে অসাড় করা বা হিংস্রভাব ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলায় বীরত্ব বা কবিত্ব কিছুই নেই। কবির কাজ তখনই সফল, যখন সমস্ত জঘন্যতার মধ্যেও তিনি মানুষকে ঊর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করেন। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোর স্পন্দন কবিই আনতে পারেন।

গত নয় মাসের যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে মানুষের পতনের, নিষ্ঠুরতার, ক্রূরতার অসংখ্য উদাহরণ যেমন পেয়েছি, আবার একটু খোঁজ করলেই জেনেছি কীভাবে সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে বাঁচিয়েছে। সত্যকারের বীরত্বের বহু নিদর্শন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে দেয় নি। আজ এই দুঃসময়ে আমি অন্তত তাঁদের কথাই বেশি করে মনে করতে চাই--কারণ তাঁরাই মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেন এবং তাঁদের পরিচয়েই মানুষের পরিচয়।

অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ যখন মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, তখন তাকে আরো উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললে ফল বিপজ্জনক হতে পারে এবং তা শত্রুপক্ষের সহায়ক হবে মনে করেই আমার প্রতিবাদ ও বিশেষ করে একজন কবির ঐ রচনা বলেই আমার আক্ষেপ। —মৈত্রেয়ী দেবী, কলকাতা-১৯।

*পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের নিম্নোক্ত এই চিঠিটি আনন্দবাজার পত্রিকায়

ক্ষমা করা হবে কি হবে না

গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা মৈত্রেয়ী দেবীর চিঠি পড়ে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। বিস্মিত হয়েছি অনেক কারণে। কারণ, তাঁর চিঠিতে প্রতিবাদের ভাষায় লেখা নয়—আক্রোশের প্রকাশ। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—সুভাষবাবুর রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। লোকমুখে শুনেছেন—সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি। এখানেও কি এমনি ধরে নিতে পারি এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও তিনি লোকমুখে শুনেছেন—এবং এমন লোকের কাছ থেকে, যিনি পড়ে কিছুই বোঝেন নি?

মৈত্রেয়ী দেবী এ রচনাকে 'বীভৎস' বলেছেন। জানি না আট মাস শরণার্থী শিবিরে কাজ ক'রে কি অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন। তবে এর চেয়েও অনেক বেশী বীভৎস ঘটনা আমাদের ব্যক্তিগত টেপ-রেকর্ডে ধরা আছে—তাঁকে শোনাতে রাজী আছি। সেই বীভৎস ঘটনাগুলোর জন্য যারা দায়ী তারা আজ মুখোশ পরে নিজের প্রাণের দায়ে—সুবিধাভোগের লোভে হাত মেলাচ্ছে—ভবিষ্যতে বড় ক্ষতি করার আশায়। অথবা পালিয়ে সুযোগ খুঁজছে বড় আক্রমণের জন্য। তাদের সমাজ চিনে নিক। তাদের কুকীর্তির ইতিহাস সমাজ জানুক। এই ইচ্ছা স্বাভাবিক। সুভাষবাবুর প্রবন্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার কোনো রসদ নেই। এমন কি বিহারী-পাঞ্জাবী সম্পর্কেও কোনো কটূক্তি নেই। এবং ঐ বিশ্বাসঘাতক দালালরা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর—তারা যে বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেয় নি, এই সংযমের জন্য তারিফ করা হয়েছে। দুই বাংলার মানুষকে কোথাও উস্কানি দেওয়া হয় নি। আর তাছাড়া যারা একটা দেশ গড়ল—এক জাতিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল। বীরের রক্ত-স্রোতে আর মায়ের অশ্রুধারায়—যারা পুঞ্জীভূত পাপকে ধুয়ে দূরীভূত করল তাদের নির্বোধ ভেবে নিজেকে বুদ্ধিজীবী ব'লে জাহির করা যায় কি?

[পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ, কলকাতা—২৮।]

প্রথম চিঠিটি বার হওয়ার আগেই 'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই' ছাড়াও আমার আরও দুটো লেখা বেরিয়ে গেছে। সুতরাং পত্রলেখিকা অন্ধের হস্তি-দর্শনের মত একটি মাত্র ঠ্যাং ধ'রে হঠাৎ কেন যে এত বারফাট্টাই করলেন, তার রহস্য আমার অজানা। তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতেও সেই এক ঠ্যাঙানির ভঙ্গি—যেখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন সেখান থেকে আর এক পা-ও নড়েন নি।

এইসঙ্গে একটা কাকতালীয় ঘটনার কথা ব'লে নিই। প্রতিবাদ-পত্রটি কাগজে যেদিন ছাপা হয় ঠিক সেইদিনই আমার এ বইয়ের চতুর্থ লেখা 'একটু হাসি ফুটুক' বার হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু সওয়ালজবাব থাকায় অনেকে ভেবে নেন আমার লেখাটি বোধহয় ঐ চিঠিরই জবাব।

আসলে কী ঘটেছিল বলছি।

'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই' বার হওয়ার পর বাজারে, বাসে এবং রাস্তায় কিছু কিছু পাঠক ঐ লেখা পড়ে তাঁদের ভয়ের কথা আমাকে বলেছিলেন। খানসেনা আর রাজাকারদের বীভৎস হত্যার বর্ণনা পড়ে রাগে লোকের মাথায় খুন চেপে যেতে পারে ব'লে তাঁরা ভাবছিলেন। 'ভয় নেই' পড়ার পর তাঁরা অনেকেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু তাঁদের প্রশ্নগুলো মনে মনে রেখে 'এবার হাসি ফুটুক' লিখেছিলাম। ঐ লেখা শেষ ক'রে পত্রিকায় পৌঁছে দেবার সময় প্রতিবাদপত্রের কথা আমি জানতে পারি এবং ওটা আমি পড়ি কাগজে ছাপা হওয়ার পর। সুতরাং আমার ঐ লেখার সঙ্গে প্রতিবাদপত্রটির কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমার যুক্তিগুলো ছিল রাস্তাঘাটে দেখা হওয়া পাঠকদের মনের সন্দেহ সংশয় উপলক্ষ ক'রে।

প্রতিবাদপত্রটির উত্তরে যাঁদের পাঠানো চিঠি ছাপা হয়েছিল অথবা

হয় নি, তাঁদের আমি এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাকে সমর্থন তাঁরা করেছিলেন ব'লে নয়, তাঁরা আমার লেখার মর্মগ্রহণ করতে পেরেছিলেন ব'লে লেখক হিসেবে আমি কৃতার্থ।

পত্রলেখিকা তাঁর চিঠিতে আমাকে যেভাবে হেয় করবার চেষ্টা করেছেন, তার জবাব দিতে আমার শালীনতাবোধে এবং রুচিতে বাধে। গোপাল ভাঁড়ের গল্পের বেয়াইয়ের মত তাঁর সঙ্গে সেয়ানে-সেয়ানে হওয়ার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।

পত্রলেখিকা 'সরকারী পুরস্কারে'র কথা তুলেছেন। টাকাটা সরকারই দেয় বটে, কিন্তু পুরস্কারটা দেয় সাহিত্য আকাদেমি। সুতরাং কেউ এই পুরস্কার পেলে তাকে 'সরকারের আস্থাভাজন' হতেই হবে, এটা কোন্ ধরনের জবরদস্তি? সরকারের প্রসঙ্গ তিনি যেভাবে এনেছেন, তাতে মনে হয় 'উস্কানিমূলক দুষ্কর্মে' প্ররোচনা দেবার মত প্রবন্ধ লেখার জন্যে শাসনদণ্ড দিয়ে তিনি আমার মুণ্ডপাত করাতে চান। রাগে যাঁর মাথার ঠিক নেই তাঁকে আমি কি ক'রে বোঝাই যে, তিনি কাকে কী ভয় দেখাচ্ছেন? কাজীর বিচারে ব'সে ণত্ব ষত্ব জ্ঞানটুকুও তাঁর লোপ পেয়ে যাচ্ছে যে!

ব্যক্তিগত আক্রমণগুলো আমি গায়ে মাখি নি। যদিও তাঁর চিঠিদুটোতে আমার লেখাটা হয়েছে উপলক্ষ মাত্র; আসলে লেখককে যা-নয়-তাই বলাটাই হয়েছে তাঁর চিঠির মুখ্য লক্ষ্য।

কিন্তু তাঁর স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়েছে, যখন আমাকে মিথ্যেবাদী বলতেও তাঁর মুখে আটকায় নি।

তিনি লিখেছেন:

'প্রবন্ধটির সত্যতাও প্রমাণযোগ্য নয়। লেখক পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখেছিলেন, তিনি বরডার থেকে দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন

যশোরে গিয়েই তিনি এত তথ্য পেয়ে গেলেন ? তিনি নিজে কতটুকু খোঁজখবর করেছেন ? যদি সত্যই তাঁর হাতে প্রমাণ থাকে, তাহলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানালেই তার উপযুক্ত প্রতিবিধান হতে পারে। এভাবে গুজব রটালে ঐ ধরনের অপকর্ম করবার প্রবৃত্তিকেই জাগিয়ে তোলা হয়।...'

তাঁর এই অভিযোগের পর আমার পক্ষে ধৈর্যধারণ করে মুখ বুঁজে থাকা শক্ত। তবু আমি যথাসম্ভব শান্তভাবেই তাঁর অভিযোগের জবাব দেব। সত্যি বলতে কি, পত্রলেখিকা প্রকাশ্যভাবে কাগজে না লিখলে তাঁকে এই উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা থাকত না। আমার এই জবাবদিহি তাঁর কাছে নয়—সাধারণ পাঠকদের কাছে।

পত্রলেখিকা আমার আগেকার লেখার জের টেনে বলেছেন যে, লেখক 'বরডার থেকে দূরেই ছিলেন'। বটে বটে! আমার সে লেখা তবে কি তিনি পড়েছেন না শুনেছেন ? সেটা অবশ্য স্পষ্ট ক'রে কবুল করেন নি। অথচ অম্লানবদনে লিখেছেন—'তিনি বরডার থেকে দূরেই ছিলেন'। আমিই নাকি একথা লিখেছি।

আমি কী লিখেছিলাম দেখা যাক।

'...পাঁচ থেকে ছ ঘণ্টা কাটিয়েছি মাইল তিনেক ভেতর অবধি বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজের শিবিরে, বাঙ্কারে আর শত্রুমুক্ত গ্রামে।'

এটা কি 'বরডার থেকে দূরে' থাকার নমুনা ? 'দূরে' বলতে তিনি নিশ্চয় 'দূর ওপারে' বোঝাচ্ছেন না ? কেননা তাহলে আর আমাকে মিথ্যেবাদী বলবার তাঁর সুবিধে হবে কী ক'রে ?

এই একটা নজীর দেখিয়ে উল্টে আমিই তাঁকে মিথ্যেবাদী বলতে পারি। কিন্তু মাত্র একটা নয়, তার আরও নজীর আছে।

'হঠাৎ একদিন যশোরে গিয়েই তিনি এত তথ্য পেয়ে গেলেন ?'

যশোরে আমি যে গিয়েছিলাম, এই স্বীকৃতিটুকু দেওয়ার জন্যে

পত্রলেখিকার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকলাম। স্বভাবসুলভভাবে তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন যে, লেখক যশোরে আদৌ যান নি—এবং আমি তাতে একটুও অবাক হতাম না। তিনি এটাও ঠিক ধরেছেন যে, যশোরে আমি 'হঠাৎ'ই গিয়েছিলাম—আমার যাওয়াটা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না।

বরডার পেরিয়ে দ্বিতীয়বার আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখনও যুদ্ধ চলছে। যখন যেখানে যাবার সুযোগ পেয়েছি 'হঠাৎ' গিয়েছি। পূর্বনির্দিষ্ট সফরতালিকা ব'লে আমার কিছু ছিল না।

পত্রলেখিকা একটু হুঁশ ক'রে আমার লেখাগুলো পড়লেই জানতে পারতেন যে, আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি 'হঠাৎ একদিন যশোরে গিয়ে' নয়--পুরো একটি সপ্তাহ বাংলাদেশের ভেতরে থেকে।

পত্রলেখিকার বোধহয় জানা নেই যে, কবিতা লিখলেও জায়গায় জায়গায় ঘুরে দেখেশুনে খবর যোগাড় ক'রে লেখার 'ছোট কাজও' আমি কিছুটা করে থাকি। কোন্ তথ্য কোথায় পেয়েছি, তার কিছু কিছু হদিশ আমার লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে। সব সূত্রের কথা সবাইকে সব সময় বলা যায় না এবং সবক্ষেত্রে বলা ঠিকও নয়। তাঁকে এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি যে, আমার সব তথ্য অভ্রান্ত ব'লে তাঁকে মেনে নিতেই হবে। আমার জানা তথ্যগুলো জানানো দরকার ব'লে মনে হয়েছে ব'লেই আমি লিখেছি।

খবরের সত্যাসত্য নির্ভর করে খবরের সূত্রের ওপর। কাজেই সংবাদ-লেখককে খবরের সূত্রগুলো বেছে নিতে হয়। খবরের উৎসে মানুষের চোখ, কান আর মন থাকে ব'লেই সব খবর সব সময় একেবারে অবিকল নির্ভেজাল সত্য হয় না—একটু বাড়ানো কমানো, কিংবা মনের একটু রং লাগানো থাকেই। লেখক তাঁর মনগড়া তথ্য হাজির করছেন না—এই বিশ্বাসের সম্পর্ক না থাকলে লেখক-পাঠকের মধ্যে

আদৌ কোনো বোঝাপড়া সম্ভব নয়।

'এত তথ্য' পেলাম কোথায়? শোনো কথা! বাড়তে বাড়তে আর হ্রস্বিদীর্ঘি জ্ঞান নেই। একেবারে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছেন! নইলে কোন্ অধিকারে তিনি আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা সব কিছুর কৈফিয়ত চান?

পত্রলেখিকা তাঁর চিঠিতে অনেক জায়গায় 'আমরা' কথাটা ব্যবহার করেছেন। এটা কি নিছক তাঁর অহংকৃত গৌরবে বহুবচন, না কি কতিপয়ের মুখপাত্র হয়ে লেখা? যেভাবে লেখা, তাতে খটকা লাগা বিচিত্র নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতই প্রবল যে, 'আমরা' দিয়ে তিনি তাঁর আমিত্বকে কোথাও ঢেকে রাখতে পারেন নি।

খটকা লাগার অন্য একটা কারণও আছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া ইস্তক এপারে যাঁরা মুখ শুকনো ক'রে বেড়াচ্ছিলেন এবং ইন্দিরা-ইয়াহিয়াকে এক ক'রে দেখাচ্ছিলেন হঠাৎ এই চিঠিটাকে তাঁরা লুফে নিলেন। তাঁদের হাতে হাতে দিনকয়েক পাইপগানের বদলে কাগজ থেকে কাটা এই চিঠিটা ঘুরতে দেখা গেল। মুখে হাসি ফুটিয়ে কপালে ফোঁটাতিলক কেটে তাঁরা রব তুললেন--হাঁউ মাঁউ খাঁউ, হিংসার গন্ধ পাঁউ। পরে অবশ্য অবস্থার বেগতিকে তাঁদের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।

তাছাড়া পত্রলেখিকার হিসেব-নিকেশের ধরনটিও ভারি অদ্ভুত। ফলে বহুকথিত সেই গল্পটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়: 'পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গুনিস কেন রে? না, আমি যে ন্যাকা। তিন কড়ায় গণ্ডা গুনিস না কেন রে? না, আমার যে কম হবে!' এর পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে: 'অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে। ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।'

এই সুযোগে আরও একটা ব্যাপারে আমি আমার আপত্তি জানিয়ে রাখি। পত্রলেখিকা 'কবি' কথাটা নিয়ে বড় বেশি প্যান প্যান করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'শুনেছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি—.' '...কেনই বা একজন কবি লিখলেন,' '...বীরত্ব বা কবিত্ব কিছুই নেই.' 'কবির কাজ তখনই সফল,' 'পলিটিশিয়ান কবি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে মর্, কবি তো হয়েছেটা কী! কবিতা লিখেছি তো লিখেছি। তাই ব'লে ওঁর নিক্তির ওজনে আমাকে চলতে হবে—এ আবার কোন্ দেশি আবদার?

পত্রলেখিকার বোধহয় ধারণা, কবিরা আলাদা কোনো জীব! আসলে তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষ। তাঁরাও রাগদ্বেষ কামক্রোধের বশ। কবি, কবিত্ব—এসব ছেঁদো কথা দিয়ে তিনি কী জুড়তে এবং কী তুড়তে চান?

আমার লেখা অকবিসুলভ হয়েছে—এটা বললে তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয়ই মানহানির নালিশ রুজু করতাম না। কেননা সেটা তাঁর নিজস্ব মতামতের ব্যাপার।

তাঁর লেখা প'ড়ে মনে হয়, আমাকে স্বভাবদুর্বৃত্ত ঠাউরে আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাতে এবং দু দেশের সরকারকে লেলিয়ে দিতে তিনি বড়ই ব্যগ্র।

অথচ অধমের লেখা তলিয়ে পড়া দূরের কথা, সে লেখায় আদৌ চোখ বুলিয়েছেন কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। তার কারণ, আমার লেখার শিরোনামটি পর্যন্ত ঠিকভাবে তিনি লিখতে পারেন নি। এমন অনেক কথা আমার ব'লে তিনি চালিয়েছেন, যা আমার লেখাতে নেই। উদ্ধৃতি দেবার সামান্য সৌজন্যটুকুও অতিরিক্তজ্ঞানে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

তিনি লিখছেন : 'এভাবে গুজব রটালে ঐ ধরনের অপকর্ম করার প্রবৃত্তিকেই জাগিয়ে তোলা হয়'। গুজব? কোন্‌টা গুজব? কোন্‌ প্রমাণের ভিত্তিতে আমার তথ্যকে তিনি গুজব বলছেন? চিঠিতে তার কোনো জবাব নেই। আমি যুদ্ধাবস্থায় গিয়েছি, দেখেছি, শুনেছি। অথচ পত্রলেখিকা প্রকারান্তরে বলেছেন যে, আমি 'নিরাপদে ঘরে বসে' খবরের কাগজে অনর্থক লিখেছি। আর তাছাড়া 'ঐ ধরনের অপকর্ম' জিনিসটাই বা কী? যখন বললেনই, তখন ঝেড়ে কাশলেন না কেন?

লিখছেন : 'ঐ বিশেষ ব্যক্তিগুলি মানুষ নয়, বিহারী মুসলমানেরা মানুষ নয়, মুসলিম লীগের মানুষেরা মানুষ নয়? পলিটিশিয়ান কবির উপযুক্ত বাণীই বটে। আমরা সামান্য লোক, মানুষে আস্থা রাখি।' বিনয়ের অবতার এই পত্রলেখিকার খুরে খুরে দণ্ডবৎ। তাঁকে বলা দরকার : গুঁতোচ্ছেন গুঁতোন—কিন্তু সাবধান! সেইসঙ্গে দেবীমূর্তির ভেতরের খড় বেরিয়ে পড়ছে যে।

খট্‌কাটা তবু কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

গোড়াতেই বলেছি, পত্রলেখিকা চিঠি পাঠাবার আগেই আমার 'ক্ষমা? ক্ষমা নেই', ছাড়াও আরও দুটো লেখা বেরিয়ে গেছে। এমন কি তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতেও একটি ছাড়া আমার আর কোনো লেখারই উল্লেখ নেই। কোনো প্রকৃত সত্যসন্ধানীর পক্ষে এটা হওয়া স্বাভাবিক নয়। চাই কি, আমার পরের লেখাগুলো থেকে নজীর তুলে তুলে পত্রলেখিকা আরও জোরালোভাবে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু ওসবের ধার দিয়েও তিনি গেলেন না। দেখা গেল, সত্য নিরূপণের চেয়ে সেই সত্যকে ধামা চাপা দেওয়াতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। যাতে খুব বেশি জানাজানি না হয়, তার জন্যেই কি তিনি

আমার মুখে হাত চাপা দেবার আগ্রহে অমন ক্ষেপে উঠেছিলেন ? লোকে যাতে আমার কথা বিশ্বাস না করে, তার জন্যেই কি প্রাণপণে তিনি আমাকে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন ? এমন একটা মানবতাবিরোধী গুরুতর অপরাধের শাস্তি না চেয়ে লঘূকরণের চেষ্টার মধ্যে কোনরকম বর্ণচোরা রাজনীতির হাত ছিল না তো ? যে জিনিস স্বল্পাকারে দেখে এবং জেনে আমি শিউরে উঠেছিলাম— বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর ক্রমশ তা আরও ব্যাপক আকারে চোখে পড়তে এবং জানা যেতে লাগল। এ সত্য ছিল এমনই পূতিগন্ধময় যে, ক্ষমাসহিষ্ণুতার চন্দনগন্ধ ছড়িয়ে তাকে কিছুতেই ঢেকে রাখা গেল না।

শুধু অপরাধ নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে অপরাধীদেরও অতঃপর বহুলাংশে চিহ্নিত করা গেছে। পত্রলেখিকা গোড়াতেই গেল-গেল ব'লে যে রব তুলেছিলেন, তাতে কারা কারা তাঁর গলায় গলা মিলিয়েছিল পাঠকেরা একবার মনে করে দেখবেন।
পত্রলেখিকা আমাকে মানববিদ্বেষী, জাতিবিদ্বেষী এবং প্রতিশোধ-পরায়ণ—এক কথায়, আমাকে ফরমান আলীর দোসর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্ত সব লেখাই আমি এই বইতে ধরে দিলাম— পাঠকদের উচ্চ আদালতে যাতে আমার আপীলের বিচার হতে পারে। পত্রলেখিকা আমার লেখাটিকে 'লোমহর্ষক' এবং 'বীভৎস' বলেছেন। সকলের দেহমনের গড়ন এবং ধাত সমান নয়। সুতরাং স্বভাবতই সেটা তাঁর মনে হতে পারে। এমন পাঠকের কথাও আমি শুনেছি, যিনি ঐ লেখা হয় শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারেন নি, নয় পড়ার পর মুখে ভাত তুলতে পারেন নি। লেখকের লেখার দোষেও এমনটা ঘটে থাকতে পারে। তার জন্যে যথাস্থলে ঘাট মানতেও আমি রাজী

আছি। কিন্তু কেউ যদি সরজমিন তদন্তে গিয়েই না-দেখে না-শুনে দূর থেকে বলেন যে, আমার দেখতে কিংবা শুনতে ভুল হয়েছে, অথবা আমি বানিয়ে বলেছি—তাহলে সেটা হবে দিনকে রাত করার গা-জুয়ারি ব্যাপার। গণহত্যার অপরাধ তাতে কিছুমাত্র কমে না; বরং অপরাধীকে আশকারা দেওয়া হয়।

পত্রলেখিকা তাঁর হিসেবমত আট মাস ধ'রে শত্রু অধিকৃত বাংলাদেশের দুঃখমোচনের জন্যে যে কাজ করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার যোগ্য। পরহিতব্রতে তিনি কি রকম নিবেদিতপ্রাণ, তার বিবরণ তাঁর চিঠিতে পেয়েছি। এটা তাঁর মহত্ত্বেরই লক্ষণ।

কিন্তু পরের কাজে নিজেকে নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত যে, আর কারো কথা কানে তোলা বা বুঝতে চেষ্টা করার ফুরসত তাঁর নেই। নইলে কোন্ মুখে তিনি বলেন যে, একটা বিশেষ জাতের নাম ক'রে তাকে আমি নিকেশ করতে চেয়েছি? তাঁর চোখে লেখক কি এমনই একজন পামর 'পলিটিশিয়ান কবি'?

যিনি জেগে ঘুমোতে চান, তাঁকে আমি কোন্ কথার কী ব্যঞ্জনা তা বোঝাই কী ক'রে? মুখের কথা আর মনের কথা—ভাষার এই দু-ধারি লক্ষণের বিষয়টা তাঁর মত বিদুষীর জানা নেই. এও কি তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

তাহলে দাঁড়ায় এই যে, পত্রলেখিকা সজ্ঞানে আমার বলবার কথা-গুলোকে বিকৃত করেছেন। বীর বা কবিপদের জন্যে এখনও আমি তাঁর কাছে উমেদার হই নি, অথচ তার আগেই তিনি গায়ে পড়ে আমাকে অযোগ্য ব'লে নাকচ ক'রে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন! এসব রহস্য আমার পক্ষে ভেদ করা মুশকিল।

কথায় কথা বাড়ে। এত কথার দরকারই বা কী! বিশেষ ক'রে, আজ সবটাই যখন ময়না-তদন্তের ব্যাপার।

এ লেখায় আমি চেয়েছিলাম ধীরস্থিরভাবে পত্রলেখিকার যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতে।

আমাকে তিনি প্রকারান্তরে অসাধু বলেছেন। আমি নাকি মিথ্যে তথ্য সাজিয়ে গুজব রটিয়েছি। তার সপক্ষে তাঁর যুক্তি? তাঁর অবিশ্বাসই তাঁর যুক্তি।

"উস্কানিমূলক দুষ্কর্মে' আমি নাকি প্ররোচনা দিয়েছি! শুধু দুষ্কর্ম নয়—'উস্কানিমূলক' দুষ্কর্ম। তাতে প্ররোচনা। কী সর্বনাশ! এমন আসামীর হাতে তো এখুনি হাতকড়া পরানো উচিত! এ অভিযোগের সপক্ষে তাঁর যুক্তি? আমার লেখা উত্তেজক ব'লে তাঁর মনে হয়েছে।

আমি নাকি কলম দিয়ে মারণযজ্ঞ শুরু করছি। এ অভিযোগ প্রমাণ হলে লেখককে তো সোজা শূলে চড়ানো উচিত। কিন্তু তার সপক্ষে তাঁর যুক্তি? গণহত্যার দুই ঘাতককে আমি গুলি করার এবং কাটার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি।

পত্রলেখিকার মনে হওয়া আর লেখকের ইচ্ছে হওয়া—ব্যস্। এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য বড় যুক্তি আর কী হতে পারে!

আমি কবুল করছি, তাঁর এই যুক্তি খণ্ডন করা আমার কর্ম তো নয়ই, এমন কি তা শিবেরও অসাধ্য।

যুক্তিনির্দেশে তাই অপারগ হয়েই আমি হয়ত এ লেখায় মাঝেমধ্যে মাথা গরম ক'রে ফেলেছি। তার জন্যে পাঠকেরা বিচার ক'রে যে সাজা আমাকে দেবেন, আমি তা মাথা পেতে নেব। পত্রলেখিকাকে আমার লেখার কোথাও যদি না জেনে কিংবা ঝোঁকের মাথায় আঘাত

করে থাকি, তাহলে তিনি যেন নিজের মহত্ত্বে আমাকে ইতরজন হিসেবে ক্ষমাঘেন্না করেন।

হ্যাঁ, এতক্ষণ শুধু ঢিলদুটোর কথাই বলেছি। পাখির কথাটা বলাই হয় নি। কেননা শুধু ঢিল নয়, সেইসঙ্গে এদিক সেদিক থেকে ধারালো চঞ্চুর আঘাতও ইতিমধ্যে আমার কপালে কম জোটে নি।

লিখেছিলাম : 'এক নির্দয় দয়েল পাখি'। 'দয়েল' লেখার জন্যে আমাকে কি রকম দ'য়ে পড়তে হয় বলছি।

বাংলা বানান নিয়ে যে এত লোক মাথা ঘামান, এই প্রথম সেটা আমার নজরে পড়ল। বাংলাভাষার পক্ষে সত্যিই এটা খুব আশার কথা। কিন্তু সামান্য একটা বানান নিয়ে এত চোখমুখ লাল করার কী ব্যাপার থাকতে পারে, আমি ঠিক বুঝি নি।

আমার অপরাধ, 'দোয়েল' বা 'দ'য়েল' না লিখে আমি লিখেছিলাম 'দয়েল'।

পাঠকেরা পড়লেই বুঝবেন 'দয়েল' কথাটা আমার লেখায় এসেছে একটা উদ্ধৃতির অন্তর্গত হয়ে। উদ্ধৃত অংশে আছে জীবনানন্দের কবিতার কয়েকটি ছত্র। ফলে, 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় যে বানান ছিল সেই 'দয়েল' বানানটাই আমাকে রাখতে হয়েছে।

না রাখলেই বা কী হত? সত্যিই তাই। বানানের এই সামান্য রদবদলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না।

কিন্তু বানান অবিকল রাখলে আমার নিজেরও যে কিছুটা মতলব হাসিল হয়ে যায়। অন্তমিলের দরুন 'নির্দয়' আর 'দয়েল' পাশাপাশি চমৎকার মানিয়ে যায়। এর মধ্যে এমন কোনো মহামারী ব্যাপার ছিল না। মূলের বানানটাও অক্ষুণ্ণ থাকল। আবার তাতে আমার মিলবন্ধনের কাজটাও চুকিয়ে ফেলা গেল। এক ঢিলে দুই পাখি।

থুড়ি, দুই ঢিল এক পাখি।

অপুতপু-কে

প্রিয় অপু আর তপু,

আজ নয়, পরে বড় হয়ে কোনো একদিন এ চিঠি তোমরা পড়বে—সেই আশায় লিখছি।

যে বয়সে তোমরা কলকাতায় এসেছিলে তখনকার দেখা দিনগুলোর কথা বড় হয়ে কি তোমাদের মনে থাকবে? হয়ত মনে নাও থাকতে পারে। কিংবা হয়ত থাকবে।

আমার অবশ্য স্মৃতিশক্তি নেই বললেই চলে। কিন্তু তোমাদের যে বয়স, সেই বয়সের কিছু কিছু ছবি আমার চোখে আজও যেন জ্বল জ্বল করছে।

যখনকার স্মৃতির কথা বলছি, তখনও আমি কোলে উঠতে পাই। উড়িষ্যাবাসী একজন ছিলেন, আমাদের বাড়িতে তিনি রান্নার কাজ করতেন। আমি ছিলাম তাঁর খুব ন্যাওটা। বাড়ির লোকদের লুকিয়ে তাঁর মুখের পান আমি কেড়ে খেতাম।

একবার লঙ্কা-দেওয়া তেলেভাজা চুরি ক'রে খেয়ে আমাকে যে কী

নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছিল কী বলব। একমুঠো চিনি গালে দিয়েও জ্বলুনি পুড়ুনি থামতে চায় না। •

দোতলায় ছিল গাড়িবারান্দা। লোহার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে চোখ পিট পিট ক'রে বাইরের দিকে তাকাতাম। টেলিফোনের তারে রংবেরঙের ছেঁড়াখোঁড়া ঘুড়ি মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় বাঁধা প'ড়ে হাওয়ায় লাট খেত। বৃষ্টির পর জলের ফোঁটাগুলো থেকে থেকে যেন হাত ফস্‌কে পড়ে যেত।

রাস্তা সারানোর সময় যখন স্টীমরোলার চলত, তখন বারান্দা ছেড়ে নড়তে চাইতাম না। কেননা আমাদের গলিটাতে তখন গাড়ি বলতে একমাত্র কিছু বড়লোকের জুড়িগাড়ি আর সাধারণ্যের ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি। গলির রাস্তায় মোটর গাড়ি দেখাই যেত না।

চোত সংক্রান্তিতে বার হত জেলেপাড়ার সং। পরে মফস্বলে চলে গিয়েছিলাম ব'লে জীবনে একবারের বেশি দেখা হয় নি।

কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা লোক আমাদের পাড়ায় হাপু গাইতে আসত। পরে বড় হয়ে কলকাতায় আসার পর এ শহরে আর হাপুগান গাইতে কাউকে দেখি নি। হাপুগান যে কী জিনিস, তা তোমাদের জানবার কথা নয়। একজন লোক কয়েক কলি গান গাইত আর তারপরই 'হা-পু' 'হা-পু' ব'লে শব্দ ক'রে হাতের চাবুকটা ঘুরিয়ে সপাং সপাং ক'রে নিজের পিঠে বসাত। হাপু গাইয়ে আমাদের রাস্তায় এলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে একছুটে বারান্দা থেকে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু হলে হবে কি, লোকটার 'হা-প্‌পু' শব্দ আর বেতের মুখে আত্মনির্যাতনের আওয়াজটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমার পিছু নিত। ঐ সময়টা আমি যেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করতাম।

এই দেখ, দিব্যি আমি নিজের স্মৃতিরোমন্থনে মজে গিয়েছি। বয়স

বাড়লে এই রকমই হয়। পুরনো দিনের কথাকে একবার লাই দিলেই অমনি একেবারে মাথায় চড়ে বসে।

আসলে আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, একদিন বড় হয়ে তোমরা তোমাদের ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে করছ।

কত কাণ্ড ক'রে মা-র সঙ্গে তোমরা কলকাতায় এলে। এ তো আর ঢাকা থেকে গাড়িতে বা প্লেনে হুস ক'রে কলকাতায় আসা নয়। তোমাদের পালাতে হয়েছিল দেশের শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে—বনজঙ্গল ভেঙে নদনদী পেরিয়ে। অতশত না বুঝলেও পরে হয়ত একটা গা ছমছমে ভয় আর পথের কষ্টের স্মৃতি মনে পড়তে পারে। সঙ্গে আব্বা ছিল না।

আব্বা তো তখন কলকাতায়। তোমাদের পথ চেয়ে আশায় আশায় ভয়ে কাঁটা হয়ে জহির দিন গুনছিল। এর মধ্যে হয়েছিল এক কাণ্ড।

জহির রায়হান কলকাতায়। এ খবর কানে যেতেই সিনেমাজগতের খবর-লিখনেওয়ালা আর ছবি-তুলনেওয়ালার দল তো জাহিরকে ছেঁকে ধরল। কথায় কথায় তোমাদের কলকাতা পাড়ি দেবার কথা জহির বলেছিল। কাগজে সে খবরটাও ভুল ক'রে রাষ্ট্র হয়ে গেল। জহিরের তখন মাথায় হাত। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গিয়ে যদি রাস্তায় তোমাদের আটক করে? ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল জহিরের। ভেবে দেখ, সেই জহির—জীবনে ভয় কাকে বলে যে জানত না। ভালবাসা, স্নেহ এমনি জিনিস।

তারপর তো তোমরা এলে। প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের একতলায় ঘর ছেড়ে তোমাদের জন্যে জহির লেক গার্ডেনে তিনতলায় খোলা-মেলা একটা ফ্ল্যাট নিল। সেই ফ্ল্যাটে তোমাদের ঘরের দক্ষিণের জানলাটা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যেত। মনে পড়ে?

বর্ষার মাসগুলোতে কালো কালো মেঘে আকাশ ভার হয়ে থাকত। আর শরৎকালে? কী ঝকঝকে নীল রাতের আকাশ! আর সকালের মিষ্টি রোদে রাস্তার ধারের খাটালটা পর্যন্ত যেন আনন্দে নেচে উঠত। তোমাদের সিঁড়িতে পৌঁছুবার গলিতে যে ভাগলপুরী গাইগুলো গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের দেখে তোমাদের ভয় করত না? তাদের ভাগাবার জন্যে তোমরা যতই হ্যাট হ্যাট করতে কিছুতেই তারা হটত না।

আব্বাকে তোমরা কতক্ষণই বা বাড়িতে পেতে? বেচারা জহির। কাজের ভিড়ে নাওয়া-খাওয়ারও সময় সে পেত না। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী লেখক-শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সে ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাদের যাবতীয় মুশকিলের আশান তাকেই করতে হত। বাড়িতে ব'সে থাকার তার সময় কোথায়? কিন্তু যে লোকটা সবার ভাবনা ভেবে বেড়াত, তার নিজের অবস্থাটা কিন্তু আদৌ সুবিধের ছিল না। তোমরা আসার আগে কতদিন যে তাকে চালচুলোহীনভাবে শহরময় বেদের টোল ফেলে বেড়াতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ শুনেছি দেশে থাকতে গাড়িবাড়ি সোনাদানা কিছুরই তার অভাব ছিল না। আবার সর্বস্ব হারিয়েও তার কোনো দুঃখ ছিল না। পৃথিবীতে প্রতিভা দুর্লভ নয়—কিন্তু সেইসঙ্গে বড় মনের মানুষ কম পাওয়া যায়।

জানো অপু-তপু, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না—জহিরের মত বড় মনের মানুষ আমি জীবনে বেশি দেখি নি।

অথচ ওর সঙ্গে যে আমার খুব বেশিদিনের মাখামাখি সম্পর্ক ছিল তাও নয়। বরং বলা যায়, বেশির ভাগ দিনই হয় আমি ওকে ওর বাড়িতে গিয়ে পাই নি, নয় ও আমাকে আমার বাসায় এসে পায় নি। তাও তো ওর সঙ্গে আমার আলাপ পুরো এক বছরেরও নয়।

মানুষকে চেনা যায় শুধু নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়, তার সঙ্গে আরও বহুজনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক দিয়ে। জহিরকে আমি চিনেছি সেইভাবে। নিজের জন্যে সুবিধে আদায়ের একটু চেষ্টা করলে কলকাতায় জহির অনায়াসে পায়ের ওপর পা তুলে বেশ আরামেই রাজার হালে থাকতে পারত।

তা তো সে করেই নি, বরং তার নিজের আর্থিক অনটনের মধ্যেও জোরবরাতের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা অকাতরে দেশের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছে। একটা কথা তোমাদের না বলে পারছি না। বড় হয়ে তোমাদের যদি কোনদিন এই ভেবে দুঃখ হয় যে, হয়ত তোমরা আরও অনেক নিশ্চিন্ততা এবং আরও আরাম-আয়েশের মধ্যে বড় হতে পারতে—তাহলে দুঃখ তাড়িয়ে নিজেদের মনগুলোকে এই গর্বে ভরে তুলো যে, তোমাদের আব্বার জগৎটা তোমাদের বাড়ির চৌহদ্দির চেয়ে অনেক, অনেক বড় ছিল। আকাশটাই ছিল তার বাড়ির ছাদ, সমস্ত চরাচর তার পা রাখার জায়গা। তোমাদের প্রতি তার গভীর ভালবাসাকে সে সমস্ত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে কানায় কানায় ভরে তুলেছিল।

এ চিঠি আমি বেশি বড় করব না। পাছে তোমরা বড় হওয়ার আগেই হঠাৎ পাততাড়ি গুটিয়ে আমার চলে যাওয়ার ডাক আসে, সেইজন্যে তড়িঘড়ি কয়েকটা কথা লিখে রেখে যেতে চাই।

একটা বছর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে কী ঝড় গেছে, সে সব তোমরা বড় হয়ে বুড়োদের কাছে শুনবে কিংবা ইতিহাসের বইতে পড়বে। সেইসঙ্গে একটা ছবি দেখো। ছবিটা পাবে পুরনো চলচ্চিত্রের মহাফেজখানায়। নাম: 'স্টপ জেনোসাইড'—গণহত্যা বন্ধ করো।

এ ছবি তুলেছিল জহির রায়হান। তোমাদের আব্বা। এ ছবি

দেখে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তোমাদের কী মনে হবে জানি না। তাতে হানাদারবিধ্বস্ত শৃঙ্খলিত সেই বাংলাদেশকে পাবে, যার সঙ্গে তোমাদের আমলের বাংলাদেশের কোনো মিল নেই এ ছবি জহির তোমাদের জন্যে তুলে রেখে গেছে যাতে তোমরা হুঁশিয়ার হও—যাতে কখনও কোনোদিক থেকে বাংলাদেশের এই হাল আর না হয়

অপু-তপু, আব্বা তোমাদের জন্যে কী রেখে গেছেন সেটা আজ না জানলেও কাল তা জানতে পারবে। সাত রাজার ধন এক মানিকের চেয়েও তা বড়। তোমাদের হাতে জহির দিয়ে গেছে স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের জয়পতাকা। তোমরা তাকে চোখের মণির মত রক্ষা ক'রো।

জহির কলকাতা থেকে যাওয়ার পর আমাদের যে কী ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল বলার নয়। তারপর হঠাৎ একদিন তার উদয় হল। মাকে নিয়ে জহির আজমীরে যাচ্ছিল। শহীদুল্লার তখনও কোনো খোঁজপাত্তা নেই। কথা ছিল হাতে সময় রেখে জহির আসবে। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। খুনীর দল ভোল বদ্‌লে শুধু যে গা বাঁচাচ্ছে তাই নয়, নতুন ক'রে শয়তানির চক্রান্ত আঁটছে। ক'দিন পর সন্ধ্যেয় একদিন বাড়ি ফিরে শুনলাম জহির এসেছিল। কাল সকালেই ঢাকা রওনা হবে। ধাওয়া করলাম ফেয়ার লন্ হোটেলে। কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। ওর হাত ধ'রে বার বার বলেছিলাম—সাবধানে থেকো, ঝোঁকের মাথায় কিছু ক'রে ব'সো না।

ওর সেই হাসি আর ওর চকচক-করা চোখ জীবনে কখনও ভুলব না।

তার পরের খবর সকলেরই জানা।

আমি কাঁদি নি কিংবা শোকে পাথর হয়ে যাই নি। আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল জহির আমার কথা শোনে নি ব'লে।

ওকে আমি বলেছিলাম নতুন একটা ছবি তুলতে। বাংলাদেশে ভাই তার নিখোঁজ দাদাকে খুঁজছে। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে নিজেকে কেন সে হারিয়ে ফেলল?

তোমরা বড় হয়ে নিশ্চয়ই জহিরের খোঁজ করবে। আর জহিরের খোঁজ নিতে গিয়ে শহীদুল্লারও খোঁজ করতে হবে। তাদের দেহের নয়, তাদের মনের খোঁজ। তোমাদের খুঁজে পেতে হবে কোথায় কোথায় তারা তাদের মন দিয়ে গেছে। আমি চাই বড় হয়ে তোমরাও সেই সেই জায়গাতেই মন দাও। লিখতে লিখতে বেলা হল। আমি এখন আসি।